এক

জাগো জাগো নগরবাসী নিশি অবসান রে—

শেষ রাত্রের দিকে শতনামপুরের দুয়ারে-দুয়ারে সন্তদাস বৈরাগী প্রভাতী গান গাহিয়া যায়। ভোর হইবার আর বেশি দেরি নাই। অন্ধকারের গুমোট ভাঙিয়া এতক্ষণে ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মাঝখানে অম্বিকাচরণের ষাট বছরের অতি পুরাতন মুখখানার উপর একটা প্রচ্ছন্ন পুলকের অস্পষ্ট আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। কপালের কালো রেখা ধরিয়া চকিত একটা আনন্দধারা অম্বিকাচরণের বিকৃত দুই স্থূল ওষ্ঠপ্রান্তে সুখস্বপ্ন রচনা করে। অম্বিকাচরণের মনে হয়—দূরে, অতিদূর কোন মন্দিরে যেন আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতেছে। সশ্রদ্ধ অন্তরে কান পাতিয়া থাকিলে সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তবে শুনিবার কান সকলের নাই। অপার্থিব একটা সূক্ষ্ম হাসির রেশ অম্বিকাচরণের ঠোঁট ভাঙিয়া অন্তরে মিলাইয়া যায়, মুখে মাঙ্গলিক প্রভাতী স্তোত্র স্বতোৎসারিত হইয়া ওঠে: ব্রহ্মা-মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী, ভানুঃ

শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতুঃ কুর্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্।...

ইষ্টদেবতার উদ্দেশে জোড়কর কপালে ঠেকাইয়া অম্বিকাচরণ পাশে দৃষ্টিপাত করেন। বিছানা যেমন শূন্য তেমনই পড়িয়া আছে, মালিনী নাই!

মাঙ্গলিক প্রভাতী স্তোত্রের সুরসূত্র হারাইয়া অম্বিকাচরণ ত্রস্তে বিছানার উপর উঠিয়া বসেন। দেখেন, ঠাণ্ডা মাটির মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া মালিনী অঘোরে ঘুমাইতেছে কমনীয় মুখখানির উপর আধবোজা শাদা চোখ দুইটি স্থিরিয়া আছে যেন কোন দুঃস্বপ্ন।

অম্বিকাচরণ ব্যথিত হন, কেন এমন হয়! এ দুঃখের যেন সান্ত্বনা নাই অম্বিকাচরণের! দুই চোখ পিঁচুটি লইয়া অপরাধীর মতো তিনি নিঃশব্দে মালিনীর শিয়রে নামিয়া যান। অনিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন; তারপর অতি সন্তর্পণে মাথায় হাত বুলাইয়া দেন। ছোট ছোট করিয়া বলেন, ওগো শুনছো...

শ্লেষ্মায় কণ্ঠ জড়ানো বলিয়া ঠিক সুরটুকু ফোটে না। সকালের দিকটা অম্বিকাচরণের কাশির বেগটা আবার বাড়ে।

মালিনীর অনিন্দ্যশ্রী মুখের দিকে খানিকক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া তিনি ইতস্তত দৃষ্টিপাত করেন। দেখেন, চাটাইয়ের বেড়ার ছিদ্রপথে আলোকরশ্মির জোয়ার নামিয়াছে

যেন শত ধারায়। মালিনীর কপালের উপর হইতে আলগোছে কয়েকটা চুল কানের পাশে দুই আঙুলে সরাইয়া দিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়ান। একটা প্রকাণ্ড অভিমান বিস্ফারিত দুই চোখের তারায় ছল-ছল করিয়া ওঠে।

লঘু পাদবিক্ষেপে আগাইয়া গিয়া অম্বিকাচরণ অভ্যাসমতো জলচৌকির উপর হইতে গামছাখানা কাঁধের উপর ফেলেন, তারপর বালিশের তলা হইতে দিয়াশলাইটা সংগ্রহ করিয়া বেড়ার গায়ে আংটায় ঝুলন্ত হুঁকাটি হাতে করিয়া বারান্দায় গিয়া বসেন। ঘরের পুষি বিড়ালটা অম্বিকাচরণের পায়ে-পায়ে আসিয়া ঘড়-ঘড় শব্দে গা ঘেঁষিয়া আদর জানায়। ঢেঁকিশালের বারান্দা হইতে বাঘা প্রভু অম্বিকাচরণের দিকে আড়চোখে এক নজর তাকাইয়া দুই-চার বার মাটিতে লেজ আছড়াইয়া দূর হইতে সম্বর্ধনা জানায়। বয়স হইয়াছে বাঘার। পূর্বের মতো এখন আর তাহার সেই প্রখর চাঞ্চল্য নাই। ঈষৎ শব্দে কান দুটা বাঘার আর চকিতে খাড়া হইয়া ওঠে না, শারীরিক অস্বস্তির দরুন এখন শুধু গাঁই-গুঁই শব্দ আর চুপ করিয়া পড়িয়া থাকাই সার হইয়াছে।

তামাক সাজিয়া অম্বিকাচরণ ডাবা হুঁকার রন্ধ্র-পথে প্রথমে একটা ফুঁ দেন, তারপর চুম্বনে চুম্বনে মুখর করিয়া তোলেন হুঁকাটিকে।

উঠানের কাপড় শুকাইবার তারের উপর নাচিয়া নাচিয়া একটা

দোয়েল পাখি প্রভাতী আলাপ করিতেছিল। ক্ষুদ্র কয়েকটা টানের পর বিলম্বিত একটা টান মারিয়া অম্বিকাচরণ ঐ দিকে কিছুক্ষণ চিত্রার্পিতের ভঙ্গীতে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকেন। একটু পরে মুখের স্বতঃস্রাবী লালা নিচের কালো ঠোঁট ছাপাইয়া নিম্নাভিমুখী হইতেই সম্বিত ফিরিয়া আসে। গামছায় মুখ মুছিয়া অম্বিকাচরণ আবার তামাক টানিতে আরম্ভ করেন।

হঠাৎ রান্নাঘরের পিছন দিকে কে যেন গুন-গুন করিয়া গান গাহিয়া ওঠে। দাঁতন করিতে করিতে কালীচরণ আসিতেছে।

অম্বিকাচরণ কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেন না। আপন মনেই তামাক টানিয়া চলেন।

উঠানে কালীচরণের উপস্থিতি আঁচ করিয়াই বাঘা হাউ-মাউ শব্দে একটা হাই তুলিয়া ঘন ঘন লেজ আছড়াইতে থাকে। দাওয়ার উপর পা দিতেই পুষি বিড়ালটা এক ছুটে কালীচরণের সামনে গিয়া লেজ উঁচু করিয়া মিউ মিউঁ শব্দে সোহাগ জানায়।

অস্বস্তি বোধ করেন অম্বিকাচরণ। প্রভুভক্তির নিদর্শন হিসাবে এই বাহুল্য অনুরক্তিটুকু তো তাঁর সম্পর্কেও হইতে পারিত!

কালীচরণ কিন্তু কোনো দিকেই ফিরিয়া তাকায় না। সরাসরি ঘরে ঢুকিয়া ছিটের হাফ-শার্টটা কাঁধের উপর ফেলিয়া বাহির হইয়া যায়।

অম্বিকাচরণ কি-একটা কথা বলি-বলি করিয়া কালীচরণের মুখের দিকে এক নজর তাকান, আবার কি মনে করিয়া যেন তামাক টানিতে আরম্ভ করেন। কিছু হয়তো বলিবেন মনে করিয়া কালিচরণ কিছুক্ষণ দাওয়ার উপর পুষি বিড়ালটার সঙ্গে পা দিয়া খেলা করে। অপ্রয়োজনে উঠানের উপর বার কয়েক পায়চারি করে, তারপর আপন মনে বাড়ির বাহির হইয়া যায়। যে পর্যন্ত না কালীচরণের রঙ্গিন জামাটা রসাকাঁটালতলার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া যায়, অম্বিকাচরণের বৈষয়িক দৃষ্টিটা ততক্ষণ কালীচরণকে অনুসরণ করিয়া চলে।

প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পূজা-আহ্নিক সমাধা করিয়া অম্বিকাচরণ আগাদায় বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ রগড়াইতে-রগড়াইতে আসিয়া দাঁড়ায় মালিনী। অম্বিকাচরণ যেন দেখিয়াও দেখেন না। কোটের বোতাম আঁটিতে-আঁটিতে মালিনীকে শুনাইয়া-শুনাইয়া বলেন, কিসে সংসারে দুটো পয়সা আসে এই চেষ্টায় আমি এদিকে প্রাণান্ত করছি, আর ছেলে আমার ওদিকে দেশোদ্ধারে লেগে গেছেন। ঘরে আগুন দিয়ে বাইরে আনন্দ করে বেড়াচ্ছেন...আর কাকেই বা কি বলবো! দেখি, আমার লাঠিগাছটা দাও...

মালিনী কোনো কথা বলে না। নিঃশব্দে মোটা বেতের লাঠি অম্বিকাচরণের সম্মুখে বেড়ার গায়ে দাঁড় করাইয়া রাখে।

অম্বিকাচরণ মনে-মনে বিরক্ত বোধ করেন, ভাবেন, কেন

লাঠিখানা হাতে তুলিয়া দিলে কি মর্যাদা চলিয়া যাইত মালিনীর! তবু হাবভাবে অম্বিকাচরণ এরূপ কোনো ভাবই ব্যক্ত করেন না। আপসোসের সুরে বলেন, কই আমার লাঠিটা।

বাধ্য হইয়াই মালিনীকে এবার অম্বিকাচরণের হাতে লাঠি তুলিয়া দিতে হয়।

কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। মাথা ঘোরে মালিনীর। কিন্তু এড়াইবার পথ কোথায়! অম্বিকাচরণ অমনি বলেন, জল এক গ্লাশ তো দিলে না আমায়।

অপাঙ্গে কটাক্ষ হানিয়া মালিনী জল আনিয়া দেয়।

এক গ্লাশ জল নিঃশেষে পান করিয়া অম্বিকাচরণের তাপিত চিত্ত শিতল হয়। মালিনীর দিকে তাকাইয়া অনুযোগের সুরে বলেন, তা রোজ-রোজ এই রকম মাটিতে শোওয়া কেন বিছানা থাকতে! ঠাণ্ডা লেগে একটা অসুখ-বিসুখ তো করতে পারে। ধর, গ্লাশটা নাও।

মালিনী কোনো উত্তর করে না। জলের গ্লাশটা হাতে করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। আর ঘোমটার অন্তরালে একটা সুন্দর টিকালো নাকের দিকে তাকাইয়া অম্বিকাচরণের চোয়ালের হাড় দুইখানি শক্ত হইয়া চাপিয়া বসে দুই দিকে।

দুর্গা দুর্গতি নাশিনী—যাত্রা করিবার পূর্বে অম্বিকাচরণ পূর্বাভিমুখী হইয়া ইষ্টদেবতার উদ্দেশে জোড়কর কপালে

তুলিয়া ধরেন। মনশ্চক্ষে ভাসিয়া ওঠে শুধু মালিনীর সুন্দর নাকটা।

অম্বিকাচরণের জুতার শব্দ দূরে মিলাইয়া যাইতে মালিনী মাথার কাপড় ফেলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়ায়। তির্যক ভ্রূভঙ্গে, একটা বেপরোয়া স্বাতন্ত্র্যাভিমান জাগে।

আদায়-তশীল শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিতে-ফিরিতে অম্বিকাচরণের কোনো দিন বেলা বারোটা, কোনোদিন একটাও হইয়া যায়। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম ও রান্নাবান্না সারিয়া নিঃসঙ্গ মালিনীকে এই দীর্ঘ সময়টা শুধু হেঁসেল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সে এক প্রাণান্তকর প্রতীক্ষা মালিনীর। অম্বিকাচরণ যদি কোনো দিন আবার মাছটা দুধটা হাতে করিয়া আসেন তো আবার ঐ অত বেলায় নূতন করিয়া উনুনে আগুন দিতে হয়; কাঁচা আমকাঠের ধোঁয়া খাইয়া চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে মালিনীর সেদিন আর কষ্টের অবধি থাকে না। উনুনের পোড়া কাঠের মতোই ক্ষোভে দুঃখে মালিনী জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

জুতা জামা খুলিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিতে করিতে অম্বিকাচরণের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। হাতপাখাখানা হাতে করিয়া জলচৌকির উপর উবু হইয়া বসিয়া অম্বিকাচরণ বসিয়া বসিয়া কিছুক্ষণ ঝিমান, একবার তামাক খান, তারপর মালাই চাকিতে সরিষার তেল ঘষিতে বসেন। সে আবার আরও আধঘন্টা-খানেকের মামলা। অম্বিকাচরণ স্নান করিতে গেলে মালিনীকে

আবার এক ক্ষুরস্থতে আসিয়া ওদিকে রাধাগোবিন্দের পূজার যোগাড় করিয়া রাখিতে হয়। শ্চন্দন তুলসী বিল্বপত্র ছাড়াও দুইটা ফুল, একটা হরীতকী, গাছকয়েক দূর্বা, কিছু তিল ও আতপ তণ্ডুল দিয়া পৃথকভাবে কাঠের টাটখানা সাজাইয়া দিতে হয়। তারপর ছোট্ট একখানি পিতলের রেকাবিতে পঞ্চভাগে আতপ-তণ্ডুল দিয়া সঙ্গে-সঙ্গে এক চাক কলা ও একখানা করিয়া বাতাসা গুছাইয়া দিতে হয়। আগে আগে মালিনী নৈবেদ্য সাজাইতে গিয়া অনেক ভুল করিয়া বসিত। এখন এসব একেবারে জলবৎ তরলং হইয়া গিয়াছে।

স্নান সারিয়া অম্বিকাচরণ পূজায় বসিলে মালিনী ভাত বাড়িতে বসে, আর দূর হইতে অম্বিকাচরণের 'অস্ত্রায় ফট্'-এর শব্দ শুনিয়া ভাতের হাঁড়ির উপর জোরে-জোরে হাতার শব্দ করে। অতি দুঃখে হাসিও পায় মালিনীর কোনো কোনো দিন।

পূজা আহ্নিক সমাধা করিয়া ভাতের থালা স্পর্শ করার পূর্বে অম্বিকাচরণ প্রথমে দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করা ফল-মূলের রেকাবিখানা নিঃশেষ করেন; তারপর ভাত ভাঙ্গিয়া বসেন। পঞ্চব্যঞ্জনে মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে ঢেকুর তুলিয়া কোনো দিন হয়তো বলেন, ভাতটা আরও একটু নরম কোরো, বড্ড বেশি শক্ত হয়। আবার যেদিন নরম করা হয়, সেদিন বলেন, বড্ড বেশি নরম হচ্ছে ভাতটা ইদানীং, একটু শক্ত থাকতে থাকতে নামাতে চেষ্টা কোরো। অন্যান্য ব্যঞ্জনাদির সম্পর্কেও

ওই একই ধরনের সার্টিফিকেট অম্বিকাচরণের—হয়েছে, তবে নুনটা বা ঝালটা একটু…

আর শুধু মালিনী বলিয়া কেন, অবিমিশ্র প্রশংসা অম্বিকাচরণ প্রাণ থাকিতে যেন কাহারো সম্পর্কে করিতে পারেন না। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এটা যেন মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। খুঁত না থাকিলেও বলিয়া যান, অত ভালোও আবার ভালো নয়। প্রথম প্রথম মালিনীর দুঃখই হইত। কত দিন গলায় দড়ি দিয়া মরিবার সংকল্প করিয়াছে, কিন্তু সাহসে কুলায় নাই শেষ পর্যন্ত। এখন দেখিয়া-দেখিয়া একরকম সহ্য হইয়া গিয়াছে সব কিছু। দুঃখ অবশ্য এখনও হয় সময়-সময়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস সহ্য না করিয়া আর উপায় কি? সার বুঝিয়া লইয়াছে মালিনী মনে-মনে।

অম্বিকাচরণের উচ্ছিষ্ট থালায় কোনোমতে দুইটা মুখে দিয়া উঠিতে মালিনীর কোনোদিন বেলা আড়াইটা-তিনটা বাজিয়া যায়। পতি পরম দেবতার থালায় খাইতে বসিয়া মালিনীর অন্নপ্রাসনের ভাত উঠিয়া আসিতে চায়। তবু খাওয়ার সময় প্রায়ই পাশের বাড়ির লাহিড়ী-গিন্নী চপলাসুন্দরী কিংবা তাঁর আইবুড়ো মেয়ে সুনন্দা আসিয়া বসেন। মালিনীর অম্বিকাচরণের থালায় না খাইয়া উপায় কি। কিন্তু চপলাসুন্দরী মনে-মনে তাহার অরুচির ব্যাখ্যা করেন ভিন্নরূপ। অকারণে তিনি চোখ দুইটা বড়-বড় করিয়া মালিনীর সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ

করেন। আর মালিনী লজ্জা ও ক্ষোভে রাঙা হইয়া মরমে মরিয়া যায়।

বৈকালের দিকে সাধা নিদ্রাটির পর অম্বিকাচরণ আবার সেই সুপ্রাচীন জলচৌকিখানার উপর উবু হইয়া তামাক [illegible]নিতে বসিলে বৈকুণ্ঠ লাহিড়ী আসিয়া হাঁক ছাড়েন : অম্বিক [illegible]হা হে। সঙ্গে-সঙ্গে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া মালিনীকে ছুটিয়া [illegible] আশ্রয় লইতে হয় ঢেঁকিশালে। লাহিড়ী আসেন, বসেন, [illegible]ক খান ; বন্ধু অম্বিকাচরণের সঙ্গে বহু-চর্চিত সামাজিক [illegible] বৈষয়িক বিষয়ে একই ধারায় কিছুক্ষণ আলাপ আলোচন[illegible]রেন। তারপর দুই বন্ধুতে বেড়াইতে বাহির হন। এই সময়টা [illegible]লনীর কেন যেন বেশ ভালো লাগে রোজই। বৈকালিক [illegible]কর্ম সারিয়া মালিনী এই দীর্ঘ বিকালটা শান-বাঁধানো সিঁড়ি[illegible] উপর বসিয়া চিরুনি দিয়া মাথার চুল আঁচড়ায় আর কত কি [illegible]বে। কোনোদিন বেড়াইতে আসে সুনন্দা, দুই দণ্ড বসিয়াই [illegible]ন কোনো বই লইবার ছুতা করিয়া কালীচরণের সন্ধান [illegible]র। তারপর চণ্ডীমণ্ডপ-ঘরের তালা বন্ধ দেখিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। মালিনীর হাসিই পায় দেখিয়া শুনিয়া। কোনো দিন মিত্তির-বাড়ির রাঙ্গা-বউ আসিয়া দুইটা মনের কথা বলিয়া যায়। মালিনী কিছু শোনে, কিছু শোনে না। ধানী-রঙা সন্ধ্যায় নারিকেল পাতার হিরন্ময় ঝালরের দিকে তাকাইয়া মালিনী বার বার আনমনা হইয়া যায়।

তারপর বাদুড়ের পাখায় ভর দিয়া আসে রাত্রি। মালিনীর বুকের ভিতরটাও কাঁপিয়া-কাঁপিয়া ওঠে; থাকিয়া-থাকিয়া মনে হয় যেন অন্ধকারের গহ্বর হইতে একখানা জীর্ণ হাতের কঙ্কাল তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

পাড়াগাঁয়ের রাত, নয়টার পরই নিশুতি হইয়া যায়। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে তো সূর্য ডোবার সঙ্গে-সঙ্গেই। প্রায় বাড়িতেই রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হইয়া যায় আটটার মধ্যেই। রাত দশটার পর আলো জ্বলে শতনামপুরে এমন বাড়ির সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু চক্কোত্তি-বাড়ির আলো রাত বারোটার এদিকে কোনোদিনই নেভে না। মালিনীরও মুক্তি নাই। মালিনীকে স্বামী-পুত্রের খাওয়া-দাওয়ার জন্য ভাতের হাঁড়ি আর ডালের জামবাটি আগলাইয়া যেমন ও-বেলা তেমনি এ-বেলা অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়া থাকিতে হয়। সান্ধ্য ভ্রমনান্তে এখানে-ওখানে গল্প-গুজব করিয়া রাত ন'টার মধ্যে অম্বিকাচরণ খুব কমদিনই বাড়ি ফেরেন। বাজারখোলার শচীকান্ত কবিরাজের দোকানে বসিয়া ভগবৎ আলোচনায় যেদিন মত্ত হইয়া ওঠেন সেদিন তো রাত এগারোটার এদিকে নয়। বারোটা, একটাও হইয়া যায় কোনো কোনো দিন। তেমন বিলম্ব হইলে কালীচরণকে সেদিন আবার লাঠি আর লণ্ঠন হাতে করিয়া অম্বিকাচরণের সন্ধানে বাহির হইতে হয়। বৃদ্ধ মানুষ, রাতে আবার ভালো

করিয়া নজর চলে না ; রাস্তায় পড়ে কি খানায় পড়ে—উপায় কি না বাহির হইয়া।

বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়া তন্দ্রাতুর মালিনীর [illegible] কাটে শুধু দাবনার উপর জঙ্গলের মশা মারিয়া আর [illegible] চুলকাইয়া। কতদিন যে তাহার আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা করে!

প্রথম রাত্রির দিকে ফিরিলে অম্বিকাচরণ যথাযোগ্যভাবে পূজা আহ্নিক সমাধা করিয়া ধ্যানে বসেন। বেশি রাত হইলে সেদিন আর পূজার্চনায় বসেন না, খড়ম পায়ে দিয়া উঠানের উপর পায়চারি করিতে করিতেই শুদ্ধচিত্তে দশবার গায়ত্রী জপ সারিয়া খাইতে বসেন। সারা দিন-রাত্রির মধ্যে পিতাপুত্রের সাক্ষাৎকার ঘটে আবার ঠিক এই সময়টাই। তাও ভালো মুখে দুইটা কথা-বার্তা হইলে শুনিবার মতো হয়। তা না, উঠিয়া পড়ে যত তর্ক। অম্বিকাচরণের সঙ্কল্প, তিনি কালীচরণকে পুত্র হিসাবে তাহার অবশ্য করণীয় কর্তব্য সমঝাইয়া ছাড়িবেনই। আর কালীচরণেরও জিদ, চোখে আঙুল দিয়া পিতৃত্ব আর মালিকস্বত্বটাই যে ঠিক এক জিনিস নহে তাহা দেখাইয়া দিবে। এক কথায় পাঁচ কথা উঠিয়া পড়ে ; অম্বিকাচরণের খাওয়াই হয় না কোনো কোনো দিন। ক্রোধোন্মত্ত অম্বিকাচরণ কোনো কোনো দিন ভাতের থালা টান মারিয়া ফেলিয়া দেন উঠানে। গোলমাল আর চীৎকার শুনিয়া উঠিয়া আসেন বৈকুণ্ঠ লাহিড়ী, সুনন্দার মা, মিত্তিরদের বাড়ির হরেকৃষ্ণ—সে এক বিশ্রী কেলেঙ্কারি

ব্যাপার ভদ্দরলোকের পাড়ায় অত রাত্রে। আর এ একদিন না, প্রায়ই লাগিয়া আছে। কত রাত যে উপোসী থাকিতে হয় মালিনীকে! অথচ মুখ ফুটিয়া কোনো কথা কাহারও কাছে বলিবার যো নাই—কলঙ্ক হইবে। দুঃখে ও ক্ষোভে অম্বিকাচরণের সংসারে কালি লেপিয়া দিতে ইচ্ছা করে মালিনীর।

দুই

এক মনে করিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু ঘটিল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং অম্বিকাচরণের জীবনে যে বিস্বাদ আসিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি! তবু সাংসারিক নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর অন্ধকার ভবিষ্যতের ভাঙ্গাচোরা রন্ধ্র-পথে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে মাঝে-মাঝে এমন অনুকূল হাওয়া দিতে আরম্ভ করে যে জীবনটা মুহূর্তে অম্ল-মধুর হইয়া ওঠে; মনে হয়, বাঁচিয়া সুখ আছে। কেন হয়, কিসে হয়, অম্বিকাচরণ অবশ্য তাহা কিছুতেই নির্ণয় করিতে পারেন না। মায়াপ্রপঞ্চময় সংসার, সবকিছু তো অম্বিকাচরণের বুঝিবারও কথা নহে, তিনি শুধু নিঃশব্দে একটু হাসেন।

দুপুর বেলা। স্নান আহার সারিয়া অম্বিকাচরণ একটু ঘুমাইবেন মনে করিয়া শুইয়াছিলেন; কিন্তু ঘুম হইল না। চোখ বুজিতে না বুজিতেই কণ্ঠনালী জ্বালাইয়া উঠিয়া আসিল একটা অম্লোদ্গার। মধ্যাহ্ন-ভোজনে তেমন কোনোই অনাচার হয় নাই, তথাপি এই বিপত্তি। অম্বিকাচরণ উঠিয়া বসেন। কলিকার আগুন তখনও নেভে নাই। ত্রস্তে হুঁকাটি তুলিয়া

পারে! তবু অম্বিকাচরণ ইতস্তত করেন। ডাকিবেন যে কেন ডাকিবেন? একটা হেতু তো থাকা চাই সব কিছুরই। একটু ইতস্তত করিয়া অম্বিকাচরণ ভারী গলায় ডাক দেন, ইয়ে কালী।

খানিকটা বাৎসল্যের দাবি, খানিকটা প্রভুত্ব করার সার্থকতায় অম্বিকাচরণের হৃৎপিণ্ডটা একটু দ্রুততালে নাচিয়া ওঠে।

একটু পরেই সামনে আসিয়া দাঁড়ায় কালীচরণ: আমায় কিছু বলছিলেন!

হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া অম্বিকাচরণ বলেন, বলছিলাম, মানে, বোসো, ওটা কি—খাতা না বই!

—এই একখানা মাসিক।

—মাসিক, সেটা আবার কি? ইংরিজি না বাংলা?

—ইংরিজি!

—হুঁঃ, কতই হচ্ছে সব কালে-কালে।

অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ অনন্যমনে তামাক টানিয়া হঠাৎ বলিয়া ওঠেন, এ সব কিছু থাকবে না, বুঝলে? কিছু থাকবে না, আবার ফিরে আসবে সেই গিয়ে তোমার পুরোনো যুগ।... দেবদ্বিজে ভক্তি, গুরুজনকে শ্রদ্ধা—গেরস্তের যা ধর্ম। মিশি তো সকলের সঙ্গেই, যণ্ড মুচির থেকে আরম্ভ করে জজকোর্টের উকিল মোক্তার কেউ বাকি নেই।...এই তো আমাদের কামাখ্যাবাবুর কথাই বলি না কেন, অত বড় একটা লেখাপড়া জানা লোক তো, কি বলেন শুনবে? হুঁ! কামাখ্যাবাবু বলেন

যে, চক্কোত্তি মশাই, এই যন্ত্র-সভ্যতার যুগে মানুষ সব হাঁপিয়ে উঠেছে জগতের, আর পারছে না কিছুতেই···তাই এত অনর্থ, এত মারকাট। এখন আবার সব ফিরে যেতে চাইছে আগেকার যুগে। কামাখ্যাবাবুর মতো একজন পণ্ডিত লোক, বললেন তো এত বড় একটা কথা!

দম লইয়া অম্বিকাচরণ আবার বলেন, সেই যে আছে না—দাও ফিরে সে অরণ্য, দাও মোরে, না কি যেন! অম্বিকাচরণ কপাল টিপিয়া ধরেন। আ-হা, এই তো সে-দিনই একটা কি বই-এ যেন দেখছিলাম কার লেখা নাঃ—মনে পড়ছে না। তা সে যা হোক, কবি পর্যন্ত তো তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে এই সত্যই উপলব্ধি করেছেন!···তা ও হতেই হবে কি না!

কালীচরণকে অন্যমনস্কভাবে মাসিকপত্রিকার পাতা উলটাইতে দেখিয়া অম্বিকাচরণ বাধ্য হইয়া কথার মোড় ঘুরাইয়া নেন। হুঁকাটি এতক্ষণে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া বলেন, তা সে যাই হোক, উপলব্ধি সকলের সমান হয় না। ও আমার এক রকম তোমার এক রকম—এ হবেই।···তারপর যা বলছিলাম, শুনেছো খবর কালকের, মামলার! কালীচরণ একটু কৌতূহলী ভঙ্গীতেই বলে, কই না; আপনি তো বলেন নি আমাকে কিছুই।

কৃত্রিম ক্ষোভের সুরে অম্বিকাচরণ সঙ্গে-সঙ্গে বলিয়া ওঠেন, বলছো তো বলিনি, কিন্তু কাকে বলবো বলতে পারো! খবর

বলবার জন্যে আমি তো আর এখন তোমার পেছনে-পেছনে ছুটতে পারিনে !···সেই মতিগতিই যদি হবে তোমার তা হলে আজ আর আমার···

ব্যর্থ অভিমানে অম্বিকাচরণ বলেন, জিতিছি; খরচাসহ ডিক্রি হয়েছে। এসেছিল শ্যামাচরণ আজ সকালবেলায়। বললে, দাদা, ও যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন ক্ষমাঘেন্না করে ডিক্রির টাকাটা অন্তত মানিয়ে-গুছিয়ে নিন। আমি মনে-মনে হাসি আর বলি, এইবার পথে এসো শ্যামাচরণ।···উঃ কি নাজেহালটাই না করেছে আমাকে আজ ক'বছর ধরে !··· মানুষের তবু কি শিক্ষা হয়।···যাক, এ মামলাটা তো অনেক করে ঠেকানো গেল, এখন আবার সেই তিলজলার মামলা, আসছে বুধবার তারিখ পড়েছে। কি দিয়ে যে কি করবো তাই ভাবছি। হাজার হলেও বুড়ো হইছি তো! সব কিছুর তাল সামলানো কি আর আমার একার সাধ্য এখন। কবে যে রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরি তার ঠিক নেই। অথচ কার জন্যে যে করি প্রাণপণ তাও বুঝিনে। তুমি, তুমি দেখছো সব, বুঝছো সব, জানছো সব, অথচ কি যে তোমার···যাক, আর বলে কি হবে সে কথা।

কালীচরণ কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া বলে, বেশ—বলেন যাব, আমিই যাব কোর্টে বুধবার।

কালীচরণের পা বাহিয়া অম্বিকাচরণের দৃষ্টি মুখের উপর

গিয়া ওঠে। বলেন, আদালতে তোমার অবিশ্যি না গেলেও চলবে, বোঝই ভারি তুমি ঐ সব মামলা-টামলার। তুমি এই ঘর ঠেকাও দেখি, হ্যাঁ। সংসারের কি দরকার অদরকার—এগুলোর দিকে নজর রাখলেও তো আমি অনেকটা নিশ্চিন্দি হতে পারি। এইটুকখানিই তুমি কর দেখি আপাতত!·· অবিশ্যি করবে, কালে সবই করবে ; এ যেতে হলে আদালতেও যাবে, সংসারও দেখবে, তবে দুঃখু যে, আমি থাকতে কিছুই করলে না, এই—এই আর কি!

অম্বিকাচরণ ডান হাতের তালুটা কালীচরণের সামনে চিৎ করিয়া তুলিয়া ধরেন। একটু পরে কালীচরণের পার্থিব অভিজ্ঞতার অকিঞ্চিৎকরতার প্রতি একটু কারুণ্যের হাসি হাসিয়া বলেন, সংসার, কতটুকু দেখেছো এ সংসারের! সবে তো এই দেখা শুরু, হে হে হে হে···বড় কঠিন ঠাঁই বাপু এই সংসার ; সামনে পেছনে সর্বদা চার চোখ করে চলতে হয়। একটু এধার ওধার করেছো কি ব্যস! আর দেখতে পাবে না নিজেকে। এমনিই···

বক্তব্য শেষ করিয়া অম্বিকাচরণ কালীচরণের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন, তারপর গাড়ু-গামছা লইয়া খড়মের শব্দ করিতে করিতে বাড়ির বাহির হইয়া যান।

কালীচরণকে কিন্তু তখনও ঠিক ঐ এক জায়গাতেই ঠায় দাঁড়াইয়া দেখা যায়। অম্বিকাচরণের ডান হাতখানা তখনও যেন তাহার সম্মুখে চিৎ হইয়া আছে।

তিন

কয়েকদিন হইল অম্বিকাচরণের শরীরটা তেমন ভালো যাইতেছে না। কি একটা অদৃশ্য অন্তর্দাহ যেন দেহের সমস্ত রক্ত রূপ রস ধীরে-ধীরে নিঃশেষে শুষিয়া লইতেছে। আর হয় মাথা নয় কোমর—একটা না একটা কন্ কন্ করিতেই থাকে সদা সর্বদা। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এতটুকু সোয়াস্তি পান না। লাহিড়ী-গিন্নি চপলাসুন্দরী বলেন, সর্দিগর্মি। জরিপের সময় সারাটা দুপুর রোদ্দুর মাথায় করিয়া মাঠে-মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য গরম লাগিয়াছে শরীরে; কাঁচা আম পোড়াইয়া মাথায় বসাইয়া দাও। সারিয়া যাইবে। লাহিড়ী বলেন, বায়ুর প্রকোপ। বায়ু কুপিত হইয়াই এই অনর্থ বাধাইয়াছে। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া অবগাহন স্নান করিয়া যাও, ভালো হইবে। অম্বিকাচরণের কিন্তু ধারণা যে সবটাই অম্বলের খেলা, বৈদ্য ভুল করিয়া রক্তপিত্ত সন্দেহ করিতেছে। আর মালিনী, মালিনীর অবশ্য কোনো ধারণাই নাই। যে যখন যাহা বলিতেছে তাহাই করিয়া যাইতেছে। কখনও মধু-সংযোগে বটিকা অন্যান্য অনুপান সহ গুলঞ্চরসে

গুলিয়া খাওয়াইতেছে, কখনও কাঁচা আম পোড়াইয়া মাথায় প্রলেপ দিতেছে, কখনও একেবারে কিছুই করিতেছে না। ভাগোর উপর ছাড়িয়া দিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। আর কালীচরণের কথা আগেও যা, এখনও তাই—সময় থাকিতে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা হোক; আয়ুর্বেদে কুলাইবে না। কিন্তু এখানেও আবার সেই সংঘাত। অম্বিকাচরণের ধনুক ভাঙ্গা পণ—ও লাল-নীল জল জীবনে কোনো দিন খানও নাই, খাইবেনও না। বলিয়া-বলিয়া কালীচরণ এখন একরকম হালই ছাড়িয়া দিয়াছে—যাহা হয় হইয়া যাক।

রোজকার মতো সেদিনও বৈকুণ্ঠ লাহিড়ী বন্ধু অম্বিকাচরণের কুশল লইতে আসিয়াছেন। মালিনী এতক্ষণ অম্বিকাচরণের শিয়রে বসিয়া পাখার হাওয়া করিতেছিল; লাহিড়ীর গলা খাঁকারির শব্দ শুনিয়া পাখা ফেলিয়া ত্রস্তে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। দরজার কোণে লাঠিটা দাঁড় করিয়া রাখিয়া বৈকুণ্ঠ লাহিড়ী অম্বিকাচরণের পায়ের দিকে বিছানার উপর পা তুলিয়া বসিলেন।

অম্বিকাচরণ আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়া জাগিয়া ঘুমাইতে-ছিলেন। নাড়া খাইয়া মুখ হইতে কম্বল সরাইয়া কিছুক্ষণ লাহিড়ীর মুখের দিকে ড্যাব-ডেবে চোখ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন; তারপর শারীরিক দুর্বলতাজনিত একটা করুণ আকুতি মুখে করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

বৌঠাকরুণ শুশ্রূষা করছিলেন নাকি! তা হলে আমি এসে তো বড়···সপ্রতিভের ভাব দেখাইয়া লাহিড়ী একটু দ্বিধান্বিত হইয়া ওঠেন। বলেন, তা আমি না হয় একটু পরেই আসব'খন। ডাঁকো তুমি ওঁকে, আসুন; আমি যাই।

অম্বিকাচরণ শশব্যস্তে লাহিড়ীর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া ব্যাজার মুখখানা লাহিড়ীর মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া অস্ফুটে বলেন, বোসো, কথা আছে।

কি রকম বোঝ, আজ—গম্ভীর মুখে লাহিড়ী প্রশ্ন করেন।

উত্তরে অম্বিকাচরণ শুধু তাঁহার ডান হাতখানা চিৎ করিয়া উপরে তুলিয়া ধরিয়া হতাশার ভঙ্গীতে বিছানার উপর ছাড়িয়া দেন।

অম্বিকাচরণের ক্লিষ্ট করুণ মুখখানার ছাপ লাহিড়ীর মুখেও প্রতিফলিত হয়। বলেন, পেটের ব্যাথাটা!

ব্যাথাটা।···লাহিড়ীর কথার জের টানিয়া অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ বিকৃতমুখে নিজের পেটটা চাপিয়া ধরিয়া থাকেন। একটু পরে বলেন, কমই বা বলি কেমন করে, তবে বাড়েনি আর, এই যা।

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করিয়া লাহিড়ী বলেন, ও যাবে, তবে ক'দিন ভোগাবে আর কি।

অম্বিকাচরণ কোনো উত্তর দেন না। শুধু হাতটা কপালে ঠেকাইয়া উপরের দিকে তুলিয়া ধরেন।

এই ধরনের মুদ্রা লাহিড়ীর সম্পূর্ণ জানা আছে। সুতরাং কথা

না বলিলেও উপলব্ধি করিতে তাঁহার এতটুকু বিলম্ব হয় না।
লাহিড়ী বলেন, হ্যাঁ, তা ওর উপর তো কোনো কথাই চলে না,
অদৃষ্ট-লিখন! বক্তব্য শেষ করিয়া লাহিড়ী যেন অম্বিকাচরণের
অদৃষ্টের দিকেই তাকাইয়া রহিলেন।

শারীরিক অস্বস্তি দাঁতে চাপিয়া অম্বিকাচরণ চুপ করিয়াই
ছিলেন, হঠাৎ দূর হইতে মালিনীর শাড়ির রঙীন প্রান্তরেখা
দেখিয়া তাঁহার ঔষধ সেবনের কথা মনে পড়িয়া গেল—নাকি
স্বরে অনুযোগ করিয়া উঠিলেন, আমার পাঁচনটা দিলে হতো
এখন, খাবার তো সময় হয়ে গেছে।

সত্যই সময় হইয়া গিয়াছে। খাওয়ার কথা ছিল বৈকাল
চারিটায়, আর এখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়-যায়। নানান
দায়িত্বের মধ্যে পড়িয়া মালিনীরও আর মাথার ঠিক নাই যেন।
ত্রস্তে ঔষধের শিশিটা হাতে করিয়া মালিনী দরজার কাছে
আসিয়া সলজ্জ ভঙ্গীতে বাঁকিয়া দাঁড়ায়। ঘরে ঢুকিবে কেমন
করিয়া। বিছানার উপর যে বৈকুণ্ঠ লাহিড়ী বসিয়া আছেন।
মালিনীর ভাবসাব লক্ষ্য করিয়া অম্বিকাচরণ বলেন, তবে দাঁড়িয়ে
রইলে কেন ওখানে, এসো। বৈকুণ্ঠকে আর লজ্জা করতে হবে
না, হ্যাঁ!

আর লজ্জা করিলেই বা চলে কি করিয়া। এ পোড়া সংসারে
অবগুণ্ঠন টানিবারও কি অবকাশ আছে। একটু পরেই তো
আসিয়া পড়িবে ভিষকরত্ন আদ্যনাথ কবিরাজ। তখন

মালিনীকেই তো লোকলজ্জা খোয়াইয়া রোগীর অবস্থাটা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে হইবে। আর আশুনাথও তেমনি কবিরাজ, এক কথা দশবার করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে। লজ্জা করিলে চলে কি করিয়া মালিনীর।

কই এসো, পাঁচনটা দাও এইবেলা। অম্বিকাচরণ শিশুর মতো সুর করিয়া আবেদন করেন।

একটু পরেই জলের গ্লাশ আর পাঁচনের শিশি হাতে করিয়া মালিনী অম্বিকাচরণের শিয়রে আসিয়া দাঁড়ায়। তারপর যথাবিধি পাঁচন সেবন করাইয়া অম্বিকাচরণের মুখে মালিনী এক কোয়া লেবু তুলিয়া দেয়। বৈকুণ্ঠ লাহিড়ীর সম্মুখে অম্বিকাচরণ মালিনীকে আর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতে পারেন না। নিতান্তই দৃষ্টিকটু হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলেন, যাও, এইবার একটুখানি বিশ্রাম কর গিয়ে তুমি, যাও···আর কতই বা করবে! এর চেয়ে পীড়নও ভালো। আঁচলখানা অম্বিকাচরণের মুখের উপর একবার চকিতে বুলাইয়া লইয়া মালিনী ত্রস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। এক ঝলক ফুটন্ত তৈল যেন গায়ের উপর ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

অম্বিকাচরণের অজ্ঞাতে লাহিড়ী তাঁহার সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া আড়চোখে একবার মালিনীকে দেখিয়া নেন। একটু পরে হাসিয়া বলেন, নাঃ, সত্যি তোমার স্ত্রীভাগ্য আছে অম্বিক বলতে হচ্ছে, বৌঠাকরুণের মতো একজন সঙ্গী পাওয়া, বিশেষ

এই বয়সে, এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। দেখছি তো আমি রোজই নিজের চোখে! কাজে-কর্মে সেবায়-শুশ্রূষায়, বেশ। হিন্দু নারী হয়ে এই তো চাই।

খুশিতে অম্বিকাচরণের হাড়সার বুকের খাঁচাটা যেন ঘন ওঠা-নামা করিতে থাকে। বলেন, তা মিথ্যে কেন বলবো বৈকুণ্ঠ, করে—খুবই করে! এই ধর না কেন অসুখ হয়ে তো পড়ে আছি আজ ক'দিন হলো ; আর আমার তো জানো, এমনিতেই খিটখিটে স্বভাব। তার ওপর অসুখ-বিসুখ হলে তো কোনো কথাই নেই ; দিন রাত ফুটফরমাস আমার লেগেই আছে। অবিশ্যি তুমি কথা পাড়লে বলেই বলছি, নইলে বলতাম না, এক মুহূর্তের জন্যেও মুখ কালো করতে দেখলাম না।

—তা তুমি আর কি বলবে সে কথার। দেখছি তো সবই নিজের চোখে।

পাঁচন খাইয়া অম্বিকাচরণ চিৎ হইয়াই শুইয়াছিলেন। হঠাৎ কনুইয়ে ভর দিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বসেন। বলেন, জানো বৈকুণ্ঠ, এক-এক সময় ভাবি যে, জীবনে হয়তো একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছি। না জড়ানোই আর উচিত ছিল সংসারে। কিন্তু আবার ভাবি···

অম্বিকাচরণের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া লাহিড়ী বলেন, না কেন, তোমার মতো বয়সে মানুষ কি আর সংসার-ধর্ম করছে না ; না, সব বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে বসেছে, হুঁঃ! সে কোনো

একটা ইয়ে না, তবে কথা হচ্ছে যে, শরীরটা তোমার তেমন সুবিধের নয়, এই একটা যা ভাবনার কথা!··· কর্মান্তিক ভোগ এ ছাড়া আর কি বলবো।

সত্য হইলেও কথাটা অম্বিকাচরণের মর্মে গিয়া বিঁধিল। অম্বিকাচরণ অনর্থক প্রয়োজনে একটু নড়িয়া-চড়িয়া জীবনের সজীবতা দেখাইয়া বলেন, বাইরে থেকে এই রকম দেখতে হলেও শরীর আমার, বুঝলে বৈকুণ্ঠ, ইদানীং বেশ ভালোই ছিল। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, কি করে যে কি হলো, একেবারে শয্যাশায়ী করে ছাড়লে। নইলে শুয়ে থাকতে দেখেছো আমায় কস্মিনকালে!··· একটু করুণ হাসিয়া বলেন, তবে মরবো না শিগগির, জানলে বৈকুণ্ঠ, এ আমি জানি!

সঙ্গে-সঙ্গেই লাহিড়ী জোর দিয়া বলিয়া ওঠেন, আরে ছি ছি ছি, কি বলে ছাখো, মরবে কেন। ও শরীর থাকলেই ব্যাধি আছে। এ কি আর একটা···

কথার ভিতর লাহিড়ী হাই তুলিতে-তুলিতে তুড়ি বাজাইয়া মঙ্গলাচরণ করিয়া বলিলেন, জন্ম-মৃত্যু বিবাহের কথা কিছু বলা যায় না হে, কিছু বলা যায় না। বুড়ো হলেই মরবে আর গুঁড়ো হলেই যে বেঁচে থাকবে এমন কি কোনো কথা আছে! ও যদ্‌লিখিতং তাহা ঘটিবেই, আমার তোমার ইচ্ছে অনিচ্ছেয় কিচ্ছু এসে যাবে না।

লাহিড়ীর বক্তব্য শেষ হইলে অম্বিকাচরণ আরও খানিকটা

ঘনিষ্ঠ হইয়া বসেন। অন্তরঙ্গ হইয়া বলেন, তোমার কাছেই বলি কথাটা, বৈকুণ্ঠ, আমার তো অহর দ্বিতীয় কেউ নেই। বলি কার কাছে এ সব মর্ম-কথা! কথাটা কি জানো, আমার যেন কেবলি মনে হচ্ছে ইদানীং যে, এই মালিনীই আমাকে মুক্তি দেবে; আমার কর্মফল এবং তজ্জনিত এই ভোগাস্তিক—এ থেকে অব্যাহতি দেবে। এখন কোত্থেকে এমন হয়, কেন হয়, এ অবশ্য আমি কিছুতেই বুঝিয়ে বলতে পারবো না তোমাকে। তবে হয়, খুবই হয় আমার এ ধারণা মনে। জানিনে ভগবানের কি অভিপ্রায়। ...বুঝতে পারো কিছু এ রহস্যের বৈকুণ্ঠ!

কিছুক্ষণ আত্মস্থ অবস্থায় চোখ বুজিয়া থাকিয়া বৈকুণ্ঠ লাহিড়ী বলেন, কিসে যে কি হয় অম্বিক, কত ভাবে তিনি যে জীবকে কৃপা করেন, সামান্য মানুষ আমরা তার কতটুকখানি বুঝি বলো!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। অম্বিকাচরণ হাতে মুখ লইয়া লাহিড়ীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকেন। ক্রমে বাহিরের অন্ধকার ঘরের ভিতর আসিয়া বাসা বাঁধে। সামান্য ব্যবধান হইলেও কাছের মানুষ দূরে চলিয়া যায়।

বৈকুণ্ঠ লাহিড়ী বলেন, এইবার তুমি একটুখানি শোও অম্বিক; অনেকক্ষণ বসে আছ এক-নাগাড়ি। আমি উঠি।

রহস্য—রহস্যই থাকিয়া যায়।

চার

কয়টা দিন চলিয়া যায়। অম্বিকাচরণের অসুখের কিন্তু কোনো উপশমই লক্ষ্য করা যায় না। প্রত্যহ নূতন-নূতন উপসর্গ আসিয়া দেখা দেয়। ঔষধপত্র দিয়া শরীরের দাহ যদিও বা কমানো সম্ভব হয়, গলনালীর প্রদাহ যায় বাড়িয়া। আবার গলনালীর প্রদাহের উপশম করিতে না করিতেই পেট ফাঁপিয়া ওঠে। খাও আর চাই নাই খাও, পেট ফাঁপা যাইবার নহে। অথচ শাস্ত্রে বলে, মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ। ভীষকাচার্য মুস্কিলেই পড়েন। ক্ষেত্রপর্পটি, শতমূল, ঘৃতকুমারী, গুলঞ্চলতা—মহা অরণ্য ঝাঁটাইয়া উঠিল চক্কোত্তি বাড়ি, কিন্তু বিশল্যকরণী পাওয়া গেল না। অম্বিকাচরণের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলে। দিনের বেলাটা তবু একরকম করিয়া কাটিয়া যায়। শারীরিক আক্ষেপগুলি তেমন প্রকট হইয়া ওঠে না। কিন্তু রাতের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন উপসর্গগুলি সব দারুণ আক্ষেপে মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। রাত যেন আর কিছুতেই কাটিতে চায় না। রোগের যন্ত্রণায় অম্বিকাচরণ যে কি করেন, আর কি বলেন মালিনী তাহার কোনো অর্থই বুঝিতে পারে না। আছেন

আছেন অম্বিকাচরণ হঠাৎ গেল গেল বলিয়া উঠিয়া বসেন। বিভ্রান্ত অম্বিকাচরণকে তখন মালিনীকে একাই সামলাইতে হয়। সমস্ত রাতের মধ্যে মুহূর্তের জন্য দুই চোখের পাতা এক করিবার সুযোগও পায় না মালিনী। উপায় কি?

মালিনী কাছে আসিলে আগে অম্বিকাচরণের অর্ধেক অসুখ সারিয়া যাইত। বেশ একটু উৎফুল্লই দেখা যাইত সময়ে-সময়ে। কিন্তু আজ যে মালিনী এত করিতেছে, অম্বিকাচরণের যেন সে দিকে কোনো খেয়ালই নাই। আশ্চর্য! 'এটুকু অনায়াসে খেতে পারবে,' 'একটুখানি ঘুমোও দেখি'—মালিনীর এই ধরনের সহৃদয় উক্তি অম্বিকাচরণকে একদিন ধন্য করিয়া দিত; ভাঙ্গা চোরা মুখখানার উপর চকিতে একটা প্রচ্ছন্ন রূপোল্লাস ফুটাইয়া তুলিত। কিন্তু মালিনীর সমস্ত প্রাণময় উৎকণ্ঠার সবিশেষ অভিব্যক্তিগুলি আজ যেন সবই ব্যর্থ। অম্বিকাচরণ আজ একেবারেই নিরুৎসাহ—পূর্ণ উদাসীন। হাঁ, না—কোনো কথার উত্তর করেন না। চৈতন্য বিরহিত অবস্থায় মাঝে মাঝে শুধু গেল গেল বলিয়া উঠিয়া বসেন। কালীচরণ তো ডাক্তার ডাকিয়াই খালাস, বিপদ বলিতে গেলে মালিনীরই।

দুঃসংবাদ পাইয়া দুপুরের ট্রেনে অম্বিকাচরণের মেয়ে-জামাই আসিয়া হাজির হইল। দুর্গা এখন আর সে দুর্গা নাই; গোবর্ধনেরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝা যায় যে, সুদূর কলিকাতা শহরের কোনো একটি

হাল-আমলের মার্জিত স্তর হইতে ইহারা নিতান্ত অশুভক্ষণে অম্বিকাচরণের অনাড়ম্বর গৃহে পদার্পন করিয়াছে। স্থানীয় পরিবেশের সহিত ইহাদের যেন একেবারেই খাপ খাইতেছে না। এমনিতে কথাবার্তার চালচলনে বেশ, কিন্তু সর্বদাই কেমন যেন একটু বেশি মাত্রায় সপ্রতিভ। সব সময়েই যেন 'অসুখ তাই কি!'—এই ভাব। মালিনী কিন্তু ঠিকই সন্দেহ করে যে, ইহাদের বাহ্যিক আচরণের ঋজুতা চরিত্রের কোথাও স্থান পায় নাই; সবটাই লোক দেখানো।

ইতিপূর্বে মালিনীর সহিত দুর্গা ও গোবর্ধনের মাত্র একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেও বছর দেড়েক আগেকার ব্যাপার, ভালো করিয়া মালিনীর সেকথা মনেও নাই। তাই গোবর্ধনের সম্মুখে আসিতে মালিনীর যেন কি রকম লজ্জা-লজ্জা করে। আর সম্পর্কে শাশুড়ী হইলে কি হয়, আসলে মালিনী তো দুর্গারই বয়সী। প্রবীন ঘন্নিগিন্নী সাজিয়া মেয়ে-জামাই জ্ঞানে গোবর্ধন ও দুর্গাকে সমাদর করা মালিনীর পক্ষে একরকম অসম্ভবই বলিতে হইবে। গোবর্ধনের দিক হইতেও কথাটা ঠিক তেমনি সত্য, কারণ বয়সের পার্থক্যটা এত বেশি যে, মালিনীকে কথায়-কথায় ঠিক শ্বাশুড়ীর মর্যাদা দিয়া চলা গোবর্ধনের পক্ষেও সম্ভব নয়। তবু যতটা সম্ভব, গোবর্ধন মালিনীর সঙ্গে সম্ভ্রম বজায় রাখিয়াই কথা বলে। কিন্তু মন তো আর মানুষের দেখা যায় না; চিত্তপট ইন্দ্রিয়াতীত। অন্যথায়,

মালিনী যে গোবর্ধনের মনোমুকুরে দুর্গাকে কন্যার আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে ইতিমধ্যেই, সে রহস্যও উদ্ঘাটন হইয়া যাইত।

মালিনী গোবর্ধনের সম্মুখে চায়ের বাটি রাখিয়া বলে, ভাগ্যে তোমরা সব এসে পড়েছ, আমি তো মুস্কিলেই পড়েছিলাম একা-একা।

সৌজন্যভরা মুখে মালিনীকে আশ্বস্ত করিয়া গোবর্ধন বলে, হ্যাঁ, একা-একা তো মুস্কিলেরই কথা। আর···হাজার হলেও বুড়ো হয়েছেন, রোগটাও তো তেমন সহজ নয়। যে কোনো অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে আর কি!

চায়ের বাটিতে এক চুমুক দিয়া গোবর্ধন মালিনীর দিকে তাকায়।

মালিনী কিন্তু এতটুকু বিচলিত হয় না; বিচক্ষণের মতো ধীরভাবে বলে, সে তো সত্যি কথাই।

মালিনীর নিকট হইতে গোবর্ধন কিন্তু ঠিক এই ধরনের উত্তর আশা করে নাই। ভাবিয়াছিল, অসহায়া মালিনী কণ্ঠ কাঁপাইয়া গোবর্ধনের কাছে তাহার প্রাণের আকুতি জানাইবে। করুণা করার সেই সুযোগটা হারাইয়া গোবর্ধন মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে।

অম্বিকাচরণের অসুখ ক্রমশ বাড়িয়া রাত্রে চরমে পৌছিল।

রোগী যেন অনিবার্যভাবে ভীষকাচার্য আশুনাথের জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচরে চলিয়া যাইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া আশুনাথ নাকি আজ বলিয়াও গিয়াছেন যে, রোগীর অবস্থা তিনি আদৌ ভালো মনে করিতেছেন না। একরকম জবাব দিয়াই গিয়াছেন বলিতে হইবে। অগত্যা জরুরি 'কল' দিয়া কালীচরণকে যোগীন ডাক্তারকেই লইয়া আসিতে হয়। যোগীন সেন ডাক্তার ভালো ; মরা মানুষ তাজা করিবার হাত-যশ আছে।

ভাবগতিক দেখিয়া লাহিড়ীগিন্নী চপলাসুন্দরী মালিনীকে ডাকিয়া বলেন, রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটিয়ে দাও বৌমা, কখন কি হয় বলা যায় না। মেয়ে সুনন্দাকে চুপি-চুপি ডাকিয়া বলেন, বাড়ির সবাইকে দুটো দুটো যা হয় দিয়ে নিজে দু'মুঠো খেয়ে নিগে যা। চক্কোত্তির অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়।

দীর্ঘ চার মাইল পথ সাইকেল ঠেলিয়া যোগীন ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া ফিরিতে কালীচরণের রীতিমতো রাত হইয়া যায়। প্রায় এগারোটা বাজে আর কি রাত। অবশ্য বিলম্বের হেতু আছে। প্রথমত রোগীর অবস্থা শুনিয়া যোগীন ডাক্তার তো আসিতেই চান নাই। বলিয়াছেন, এখন শেষ সময়ে গিয়ে আমিই কি কিছু করতে পারবো! আর ডাকবেই যদি তো সময় থাকতে ডাকতে কি হয় তোমাদের!

কিন্তু তবু কালীচরণের সনির্বন্ধ অনুরোধ যোগীন ডাক্তারকে রাখিতেই হইয়াছে। বলিয়াছেন, আচ্ছা—বলছো যখন এত

করে তখন চলো বাক্সটা নিয়ে, তবে যে রকম অবস্থা শুনলাম, তাতে এ যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না ; স্রেফ বদনামের ভাগী হওয়া।

বড্ড কষ্ট হচ্ছে ?—অম্বিকাচরণের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া যোগীন ডাক্তার চেঁচাইয়া ওঠেন।

অম্বিকাচরণ কোনো সাড়াশব্দ করেন না। রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় শুধু যোগীন ডাক্তারের দিকে তুলিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া থাকেন।

যোগীন ডাক্তার আবার চেঁচাইয়া বলেন, জল খাবেন, জল ?

অম্বিকাচরণ নিরুত্তর। আকারে ইঙ্গিতেও কোনো কিছু ব্যক্ত করার প্রয়াস পান না।

বিকার যখন আসিয়া গিয়াছে, তখন সকলেরই মনে হইল, বুঝি বা অবস্থাটা এবার একটু ভালোর দিকে। সঙ্কট কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্টেথেসকোপটা পাঞ্জাবির পকেটে রাখিতে রাখিতে যোগীন ডাক্তার চোখে মুখে যে-ভাব ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আর কাহারো সন্দেহের অবকাশ রহিল না। আসন্ন বিপদ মুহূর্তে সকলের চোখে-মুখে কালো ছায়া লেপিয়া দিল। সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল কখন কি হয়।

উঠিবারই কথা। অম্বিকাচরণ চলিয়া যাইতেছেন। সাতযুগ জীবনকালের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্তান্তের যবনিকা টানিয়া পটক্ষেপ হইতেছে। এ একটি বিরাট ঘটনা।

ডাক্তার যোগীন সেন ঔষধের বাক্সটা হাতে করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া যান্। গোবর্ধন ইনজেকশনের কথা পাড়িলে যোগীন ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া বলেন, যাক, শেষ সময়ে আর খোঁচাখুঁচি ক'রে লাভ কি।

বৈকুণ্ঠ লাহিড়ী দাওয়ার উপর বসিয়া চঞ্চলচিত্তে তামাক টানিতেছিলেন। হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে সমবেত আর্তকণ্ঠ শুনিয়া সচকিত হইয়া ওঠেন। হাত হইতে সটকাটা খসিয়া নিচে পড়িয়া যায়। সুনন্দা দুর্গাকে সামলাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। মালিনী চোখ মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। গোবর্ধনকে দেখিলেও খানিকটা আহত বলিয়াই মনে হয়। শুধু কালীচরণের চোখেমুখেই তেমন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। কে জানে, কি ভাবে লইয়াছে সে ঘটনাটিকে।

চপলাসুন্দরী এতক্ষণ অবিচলিত ছিলেন। হঠাৎ লাহিড়ীকে দেখিয়া অনেক কথাই তাঁহার মনে পড়িয়া যায়। হয়তো ভাবেন শাঁখা-সিঁদুর বজায় থাকিতে থাকিতে এখন ভালোয়-ভালোয় যাইতে পারিলে হয়।

এতক্ষণে লাহিড়ীগিন্নী চপলাসুন্দরীর চোখে জল ভরিয়া আসে।

পাঁচ

কাজকর্মের সুবিধার জন্য চণ্ডীমঙ্গপ ঘরের মাঝামাঝি একটা পার্টিসন তুলিয়া কালীচরণ দুইখানি ঘর বাহির করিয়া লইয়াছে। ছোট ঘরখানায় কালীচরণ ডাক্তারখানা খুলিয়াছে, আর অপেক্ষাকৃত বড় ঘরখানার নামকরণ করিয়াছে, চাষী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান। সামনে টানা বারান্দা।

ছোট ঘরখানার প্রবেশ পথে ডানহাতি বেড়ার গায়ে কালো কাঠের উপর শাদা রঙে লেখা, ডাক্তারখানা। তাহার নিচেই হিন্দি অনুবাদ, দাওয়াখানা। সময় ছয়টা হইতে আটটা। দেওয়ালের লাগাও লম্বা করিয়া একখানা বেঞ্চি পাতা—রোগীদের বসিবার স্থান। ঘরের মধ্যে এককোণে শতরঞ্জি বিছানো ছোট একখানি খাট; আর পার্টিসন ঘেঁষিয়া মাঝারি সাইজের একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড আলমারি বসানো। আলমারির মাথা নারিকেলের দড়ি দিয়া পেঁচাইয়া পার্টিসনের খুঁটির সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধা, সাবধানের মার নাই। আলমারির উপরের তিনটি তাক হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধে ঠাসা আর নিচের তাকে পর-পর সাজানো ডাক্তারীশাস্ত্র সম্পর্কিত কতকগুলি মোটা

মোটা বই। দেওয়ালের গায়ে ডাক্তার হানিম্যান সাহেবের একখানা শাদাসিদে সাবেকী ফটো, বুনো হাঁসের পালকের কলমের সাহায্যে ভদ্রলোক যেন কি লিখিতেছেন।

এই হইল কালীচরণের ডাক্তারখানা। আর দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া অপেক্ষাকৃত বড় ঘরখানাই হইল চাষী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান। ঘরে ঢুকিতেই চৌকাঠের মাথার উপর বড় বড় লাল অক্ষরগুলি জ্বল জ্বল করিয়া ওঠে।

চাষী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান এখন বন্ধ। ডাক্তারখানা খুলিয়াছে। বারান্দার বেঞ্চিখানার উপর তলপেটটা সজোরে ধরিয়া ভোর হইতে বসিয়া আছে নান্টা জমাদারের বউ বাতাসিয়া। হাতে একটা অপরিষ্কার সবুজ রঙের শিশি—দাওয়াই লইবে।

হাতের কাজকর্ম সারিয়া কালীচরণ রোগী দেখিতে আরম্ভ করে। রোগের আনুপূর্বিক একটা মোটামুটি ইতিহাস শুনিয়া বলে, শিশি এনেছো!

বাতাসিয়া ঔষধের শিশিটা কালীচরণের দিকে আগাইয়া দেয়। হাতের রঙবেরঙের বাহারী বেলোয়ারী চুড়ির জলতরঙ্গ বাজে রিন্ টিন্ টিন্।

বহুৎ দুখতা, না ?—কালীচরণ রোগিনীকে প্রশ্ন করে।

সর্বাঙ্গে মোচড় খাইয়া বাতাসিয়া বলিয়া ওঠে, বহুৎ খুব বাবুজী। এত দুঃখেও সলজ্জ হাসিটি বাতাসিয়ার কিন্তু লাগিয়াই আছে দুই ঠোঁটে।

—রাত্রে তাড়ি খেয়েছিলে ক' ভাঁড় ?

বাতাসিয়া এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না। ঘোমটার আড়ালে সুর্মাটানা কালো চোখ দুইটি শুধু সরমে আনত হইয়া যায়।

চোখমুখ ফুলা শীর্ণকায় একটা লোক হামাগুড়ি দিয়া বারান্দার উপর উঠিয়া বসে। যেন মানুষ নয়—মানুষের প্রেত। সামান্য পরিশ্রমেই লোকটার হাড়সার বুকটা ঘন ঘন দোঁপে। নাক দিয়া নিশ্বাস টানিয়া সারিতে পারে না ; হাঁ করিয়া শ্বাস নেয়। দরজার সামনে আগাইয়া গিয়া বলে, আমার বড্ড ব্যামো ডাক্তার বাবু, বুড্ড ব্যামো।

লোকটা কালীচরণের ঠিক পরিচিত নয়। তবে ইতিপূর্বে বার দুয়েক আসিয়া ঔষধ লইয়া গিয়াছে।

ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে লোকটা। কোনো দিকে ফিরিয়া তাকায় না।

কালীচরণ বলে, ব্যামো তো বুঝলাম, কিন্তু কি ব্যামো, কতদিন ভুগছো তা তো কিছু বললে না। ভালো করে বলো অসুখের কথা, তবে তো বুঝবো !

লোকটা আকারে ইঙ্গিতে কোনো কিছুই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে না। যেমন তেমনই বসিয়া থাকে।

লোকটার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বাতাসিয়ার হাসি পায়, রাগও ধরে। চুপ করিয়া থাকিলে ঔষধ দেওয়া কি করিয়া সম্ভব হয়

ডাক্তারের পক্ষে! ঝাঁঝিয়া বলে, আরে বাতা না রে। চুপচাপ রহেনেসে দাওয়াই য়্যাসাই মিল যায়েগা?

সমদুঃখীর সহানুভূতি সহ্য হয় কিন্তু করুণা বা শাসন বোধ করি অসহ্যই হইয়া ওঠে।

লোকটি খেঁকাইয়া ওঠে, বাতাবেডা কি শুনি। বললাম তো ব্যামো হয়েছে! এ-হে-হে-হে, তুই চুপ কর। দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথাটা আবার গুঁজিয়া বসে লোকটা।

বাতাসিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিয়া ওঠে, আদমী না ঘোড়া বা।

তারপর সবুজ রঙের ঔষধের শিশিটা লইয়া আপন মনে চলিয়া যায়। লোকটির দিকে ফিরিয়াও তাকায় না একবার।

দুঃস্থ লোকটার দিকে আগাইয়া আসে কালীচরণ—বলে, থাকো কোথায় তুমি!

—হাটখোলা।

—হাটখোলা! হাটখোলা কার বাড়ি!

—ঘর দোর নয় বাবু, গাছতলা। গাছতলায় পড়ে থাকি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কালীচরণ বলে, আগে কি করতে, থাকতে কোথায়!

—আগে কাজ করতাম মদন সা'র গুড়ের আড়তে। তা এই অসুখ হয়ে পর গতরে আর খাটতে পারিনে বলে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—কেউ নেই তোমার?

—ছিল একদিন কিন্তু আজ আর কেউ নেই। আকালের দাপটে সব ধুয়ে মুছে গেছে। নাচার বাবা আমি শেষকালে এসে পড়ে মরেছি আপনাদের ঐ হাটখোলায়। ডা এ প্রাণ যায়ও না, থাকেও না।

সর্বাঙ্গে শোথ, চোখ মুখ সব ফুলিয়া পড়িয়াছে জলে ডোবা মানুষের মতো, কী ঔষধ দিবে কালীচরণ ইহার! তবু ঔষধ দিতেই হয়। চারিটা পুরিয়া দিয়া বলে, ছাখো, তুমি বরং জেলা বোর্ডের হাসপাতালে যেও এর পর থেকে, এখানে এসো না। আমার কাছে তেমন ভালো কোনো ওষুধ নেই, বুঝলে?

লোকটা কি বোঝে কে জানে। বিড় বিড় করিয়া হয় তো কালীচরণকেই গালমন্দ পাড়িতে পাড়িতে চলিয়া যায়। অভিযোগ আর নালিশের যেন অন্ত নাই লোকটার।

ছয়

বেলা হইলে আধ-ময়লা দোলাইখানা কাঁধে ফেলিয়া গোলাম হোসেন যথারীতি আসিয়া হাজির হয়, ডাক্তারখানার কাজ শেষ করিয়া কালীচরণ তখন সফরে বাহির হয়। সুদূর গ্রামাঞ্চল ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাষী-মঙ্গল-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নিরক্ষর চাষীদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেয়। বলে, পাঁচজনের স্বার্থের দিকে চেয়ে নিজের স্বার্থটা একটুখানি তুচ্ছ করলেও লাভ বই লোকসান হবে না মিঞা, বুঝলে! কারণ তাতে করে, কথার কথা বলছি, ধর যদি তুমি ঠকই, তো অনুতাপ আসবে না সেরকম। কেন না, তখন তোমার অন্তত এই বুঝটা থাকবে যে, নিজের একটুখানি লোকসান গেলেও তোমার আর পাঁচজন গেরস্ত ভাইয়ের স্বার্থটা বজায় থেকেছে। এখন এই ভাবটা যদি সকলের মধ্যেই বজায় থাকে, আমি যদি তোমার স্বার্থ দেখি, তুমি যদি দেখ আমার স্বার্থ, তো মোটের ওপর আমরা ক্ষতিগ্রস্ত খুব কমই হব। বাঁচবারও একটা পথ খুলে যাবে···তাই বলছি, বলি চাষী-মঙ্গল-প্রতিষ্ঠান হলো গিয়ে তোমার গেরস্ত চাষী-ভাইদের প্রতিষ্ঠান; যেমন নাকি

প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল একদিক দিয়ে তোমার ওপর নির্ভর করছে, তেমনি আবার তোমার মঙ্গলও ঐ প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলের ওপরই নির্ভর করছে, কাউকে ছেড়ে কারো মঙ্গল নেই। সুতরাং সব দিয়ে চাষী-মঙ্গল-প্রতিষ্ঠানকে জোরদার করে তোলা, চাষী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উন্নতি করা, চাষী-মঙ্গল-প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মেনে সেই মতো কাজ করা—প্রত্যেক গেরস্থ চাষীরই অবশ্য কর্তব্য।

বিশ্লেষণ অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গেই ধন্বন্তরীর কাজ করে না। সন্দিগ্ধদৃষ্টি প্রবীণ চাষীরা কালীচরণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলে, উঠেছে বটে এট্টা হাওয়া।

সতর্ককর্ণ গোলাম হোসেন অমনি মোড়ল চাষীদের কানের কাছে মুখ লইয়া ঈষৎ চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করে, বল কথাডা ধ্বনি না প্রতিধ্বনি।

জনৈক বৃদ্ধ চাষী হাসিয়া বলে, কথাডা নায়েব মশায় সেদিন বলিছিল যথাথ।

স্মিতহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া গোলাম হোসেন বলে, হুঁ, তাই বলছি বলি কেমন কথা হলো, মাঠের চাষীর মুখ দিয়ে তো কখনও এমন ধূর্ত কথা বেরুবে না।

কৌতূহলী জনৈক চাষী আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করে, আচ্ছা মিঞাভাই, তুমি জানলে কেমন করে বল দিখি।

ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া গোলাম হোসেন আবেগভরে বলে, এ আরার একটা কথা হলো। চাষা চাষার মনের কথা বুঝবে না

তো কি বুঝবে গিয়ে তোমার ঐ জমিদারের নায়েব নাকি? রক্তে রক্তে নাড়িতি নাড়িতি টরে টক্কা চলে, তুমি মুখ দিয়ে বলবা আর আমি তাই কানে শুনে বোঝবার অপেক্ষা রাখি মনে করোছো। রাজা জমিদার হলো গিয়ে খোদার প্রতিভূ। পুঁথিতি লেখে। আমরা চাষারা কানে শুনে তাই বিশ্বাস করি। অথচ সেই প্রতিভূ যখন পরকালের দোয়াই দিয়ে চাষার ইহকাল কোরক করে বলে, তখন পিরথিমিতি নালিশ জানাবার মতো আমাদের কোনো কোর্ট নেই। আর পাঁচজনের মতো আমরাও যে মানুষ এই হুঁশটা পর্যন্ত আমাদের চুরি হয়ে গেছে। অথচ এই সর্বনেশে ডাকাতির কথা মুখ ফুটে কইলি পরে আমরাও হলাম গিয়ে তোমার পয়লা নম্বরের আসামী। জ্বলে পুড়ে যাক, ধুয়ে মুছে যাক, রা কেড়েছো কি অধম্ম হলো। হায় রে ধম্ম!

সমবেত চাষীরা গোলাম হোসেনের কথার মধ্যে যেন তাহাদের মনের কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়। এমন করিয়া অন্তরের কথাগুলি ইতিপূর্বে তাহাদিগকে আর কেহই বলে নাই। বিমুগ্ধ মূক জনতা গোলাম হোসেনের মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে; স্থির মৌন মুখে জাগে তাহাদের অন্তরের অকৃত্রিম সম্মতি।

একজন জোয়ান চাষী আগাইয়া আসিয়া বলে, কি কচ্ছম খেতে বল খাচ্ছি।

তাহার পিছু পিছু আরও অনেকে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের মুখেও ঐ এক কথা।

গোলাম হোসেন বলে, কেন, কছম খাবা কেন; তোমাদের মুখের কথাডা কি ফেল্না!

—কেন ফেল্না কেন হবে! জান্ গেলেও জবান ঠিক থাকবে। তবু মুখের কথায় যদি বিশ্বাস না কর তাই বললাম, বলি, কি কছম খেতে বল খাচ্ছি।

গোলাম হোসেন প্রসন্ন মুখে যুবকটিকে আলিঙ্গন করিয়া বলে, বীজধানের নাগাল আমার এই সব বাড়ন্ত নাতিরা থাকতে চাষীর দুঃখ কিসের! গোলাম হোসেনের চোখে জল দেখিয়া প্রবীণ চাষীদের চোখও সজল হইয়া ওঠে। গোলাম হোসেনকে তাহারা সস্নেহে বাহুবেষ্টন করিয়া বলে, দেখ দিকি কি জ্বালা। হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহারা গোলাম হোসেন ও কালীচরণকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া গুড়-জল ও তামাকু সেবনে আপ্যায়িত করে।

গুড়-জল খাইয়া যতটা না তৃপ্তি আসে সমবেত চাষী-ভাইদের বিশ্বাস আর ভালোবাসা পাইয়া কালীচরণের আর আনন্দের সীমা থাকে না।

জল খাইবার সময় গোলাম হোসেনের টুঁটিটা যান্ত্রিকশব্দে ঘন ঘন ওঠা-নামা করিতে থাকে। একজন বোকা-গোছের চাষী বলে, চাচা যেন রেল-ইঞ্জিন, জংসন ইষ্টিসনে মেসিনি জল ভরতি করে নিচ্ছে।

বেলা গড়াইয়া সূর্য ঠিক কালীচরণের মাথার উপর ধক্‌ধক্‌ করিয়া জ্বলে। প্রচণ্ড উত্তাপে মুখের লালা শুকাইয়া তালু পর্যন্ত কাঠ হইয়া যায়। বিশুষ্ক ক্ষতের মতোই গলনালীর ভিতরটা চিন্‌চিন্‌ করিয়া জ্বলিতে থাকে।

নিঃঝুম দ্বিপ্রহরে সুউচ্চ আম্রবৃক্ষের মগডালে ঘুঘু-দম্পতির অলস প্রেমকূজন নিস্তব্ধতাকে আরও গম্ভীর করিয়া তোলে। কোনো গৃহস্তের প্রাঙ্গণে পুঁই-মাচার ছায়ায় একটা বৃদ্ধ মোরগ ঠোঁট ফাঁক করিয়া এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ঝিমায়। ঈষৎ চাঞ্চল্যে নিমীলিত চোখ দুইটি তাহার ঘন ঘন খুলিয়া যায়; মাথার রাঙা উষ্ণীষটা বিজয়ীর ভঙ্গীতে চকিতে দুলিয়া ওঠে। পর মুহূর্তেই চক্ষুদ্বয় তাহার তন্দ্রাহত হইয়া বুজিয়া আসে, রক্তিম চোখ দুইটিকে আড়াল করিয়া সহসা নামিয়া আসে একটা শাদা পর্দা।

আঁকা-বাঁকা পথ, ক্ষেতের সর্পিল আল, গৃহস্থের উঠান, পুকুরের পাড়, ছায়াচ্ছন্ন বাঁশতলা দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক বেলায় কালীচরণ বাড়ি ফেরে।

গোলাম হোসেনের ক্লান্তি নাই। তিলজলা পার হইয়া যায় আরও দক্ষিণে—কদমগাছি, চিংড়িহাটা, স্বরূপনগর।

কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়া মালিনীর কয়েকটা দিন কাটিয়া যায়। আবার জীবনের সেই মন্দাক্রান্তা গতি; সময় যেন আর

কিছুতেই কাটিতে চাহেনা। কোনো সময় লাহিড়ী-গিন্নী চপলাসুন্দরী আসেন। সামান্য তরিতরকারির আলোচনাটাকে যুক্তির ঘায়ে ঘায়ে আধ্যাত্মবাদের দিকে লইয়া যান। আনেন রামায়ণ, আনেন মহাভারত; তারপর আচার ও ধর্ম-সঙ্গত বিবিধ প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া হিন্দু-বিধবার ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করিয়া 'গুরু গুরু' বলিয়া উঠিয়া পড়েন।

কোনো সময় ছেলে কোলে করিয়া আসে সেনেদের বাড়ির নূতন বউ সরযূ; অপরের কান্না থামাইতে আসিয়া নিজেই কাঁদিয়া মুখ ফুলাইয়া যায়।

কোনো কোনো সময় পিছনের খিড়কির দরজা দিয়াই হুট করিয়া বৈকুণ্ঠ লাহিড়ী আসিয়া পড়েন। জোরে-জোরে কয়েকটা গলা খাঁকরি দিয়া মোটামুটি সকলকেই একবার খবরদারি করিয়া যান। আর সুনন্দার হইয়াছে প্রতিবেশীর বিড়ালের স্বভাব; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টাই চক্কোত্তি বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও দুর্গার গলার সঙ্গে গলা মিলাইয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান করে, কখনও গোবর্ধনের সঙ্গে ঠাট্টামস্করা করে, কখনও বা স্বেচ্ছায় কালীচরণের ঘর গুছাইয়া গলদঘর্ম হয়। কোনো কোনো দিন বৈকালবেলার দিকে আসে পদ্মাবতী; দুই কলি কীর্তন শুনাইয়া বড় এক ডালা সিধা লইয়া যায়।

এদিকে গোবর্ধনের ছুটিও প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। আর

মাত্র দুইটা দিন। পাড়া-গাঁ দুর্গারও আর ভালো লাগে না। কয়দিন হইল মনটা নাকি সর্বদাই তাহার কলিকাতা-কলিকাতা করিতেছে। চেষ্টা করিলে অবশ্য ছুটির যে মেয়াদ আরও কয়টা দিন গোবর্ধন বাড়াইয়া লইতে না পারিত এমন নহে; কিন্তু দুর্গার নাকি এখানে আর এক মুহূর্তও তিষ্ঠিবার ইচ্ছা নাই। সময়ে অসময়ে ঐ এক সুনন্দা, জামাইবাবুর সম্পর্কে গোবর্ধনের দাঁতে দাঁত পাতিয়া বসিয়া এক নাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আজে-বাজে গালগল্প আর হি হি করিয়া হাসিয়া যায়; দুর্গার কি রকম ভালো লাগে না। আর তারপর এই কথাই সব নয়। মনিমা মালিনীর সম্পর্কেও গোবর্ধনের ঐকান্তিকতাটা যেন ইদানীং একটু বিসদৃশই লাগে দুর্গার চোখে। অবশ্য সহানুভূতি দেখাইবার প্রয়োজন যথেষ্টই আছে, সে কথা দুর্গা কেন, কেহই অস্বীকার করে না; কিন্তু সব কিছুরই তো একটা ভঙ্গী আছে। চক্কোত্তির লোকান্তরের পর মালিনী গয়নাগুলি সব খুলিয়া রাখিয়াছিল। গোবর্ধনই পীড়াপীড়ি করিয়া মালিনীকে সোনার মফচেনটি গলায় দিতে বাধ্য করিয়াছে। এখন স্থান পাড়াগাঁ, মানুষগুলোও সব সেকেলে ধরনের, বিরুদ্ধ সমালোচনা হইবারই কথা। দুর্গা ঠিকই বুঝিয়াছিল যে, চপলাসুন্দরী জিনিসটা কখনই ভালো চোখে দেখেন নাই। কিন্তু কার কথা কে শোনে, গোবর্ধন জোর করিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, আজকাল সকল বিধবাই সোনা ব্যবহার করিয়া থাকে।

আংটি ছিল না, সুন্দর একটি মিনে করা আংটি গোবর্ধন মালিনীকে প্রণামী দিয়াছে। বলিয়াছে, সধবাই হোক আর বিধবাই হোক, মেয়েদের হাতে সোনা না থাকিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। শুধু কি এই! আদিখ্যেতা আর কত সহ্য করিতে পারে দুর্গা। লোকলজ্জা বলিয়াও তো একটা কথা আছে! ধরা যাক, সামান্য কাপড়ের কথাটাই। মোটা থান কাপড় কার না টানিতে কষ্ট হয়! কিন্তু তাই বলিয়া সামান্য একখানা থানধুতির দাম যদি এয়োস্ত্রীর শৌখিন রামধনু শাড়ির দামকেও ছাপাইয়া ওঠে তবে সাধারণ লোকে কি বলিবে! অবশ্য দাম কম না বেশি, কাপড় মিহি কি মোটা তাহার উপরেই ব্যাপারটার ভালো-মন্দ বিচার চলে না। কিন্তু দেশের শতকরা নিরানব্বই জন লোকই যদি গোটা বৈধব্য জীবনটাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন কৃচ্ছ্রসাধনের অধ্যায় বলিয়া গণ্য করে তবে মূল্যবান মিহি থানের প্রশ্নটা ওঠে বই-কি। সকলের চোখ সমান নয়। সোজা কথা ঘুরাইয়া বলার লোকের অভাব নাই সংসারে! অতএব ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করার তো কোনো কথাই ওঠে না, সামনের দুইটা দিন ভালোয়-ভালোয় কাটিয়া গেলে হয়।

রাত বারোটা। চণ্ডীমণ্ডপ ঘরের আলো তখনও নেভে না। কালীচরণ বাড়িই ফেরে অনেক রাত্রে, তারপর খাওয়া-দাওয়া

শেষ করিয়া যদি কোনো দিন আড়বাঁশি বাজাইতে বসে তো রাত একটার এদিকে আর শোওয়া হয় না।

এক ঘুম দিয়া উঠিয়া গোবর্ধন দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করে, এত রাতে আবার বাঁশি বাজায় কে হে! বাঃ ভারি চমৎকার বাজায় তো!

দুর্গা কোনো কথা কয় না। পাশ ফিরিয়া টানিয়া-টানিয়া নিশ্বাস লইতে থাকে।

গোবর্ধন দুর্গাকে মৃদু একটা ধাক্কা মারিয়া বলে, এই, চালাকি হচ্ছে, না! ওঃ কতই যেন ঘুমিয়েছেন। উত্তর দিচ্ছ না কেন?

দুর্গা আর হাসি চাপিতে পারে না। ফিক্ করিয়া হাসিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে-শুইতে অনুনাসিক শব্দে অনুযোগ করে, বা রে, ঘুম পায় না বুঝি।

—ঘুমন্ত মানুষ বুঝি কথা কয়।

—আলবাৎ কয়!

—কখনও না।

—একশোবার কয়।

—তবু ঘুমন্ত মানুষ কইবে? আচ্ছা, দাঁড়াও ঘুমন্ত মানুষের ঠোঁটদুটো আমি শেলাই করে দিচ্ছি।

গোবর্ধন এবার একটু ভারিক্কি চালেই প্রশ্ন করে, না সত্যি ঠাট্টা নয়, উত্তর দাও আমার কথার।

দুর্গার কথায় যেন কোনো প্রাণ নাই। গা ছাড়া ভাবে বলে,

বল। গোবর্ধন বলে, আচ্ছা, তোমার এই নতুন মা-টির কথা তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছো? অবস্থা যা তা তো দেখছোই, এখন কর্তব্য কি? পাড়াগাঁয়ে তো আর একলাটি ফেলে চলে যাওয়া যায় না। দেখবে কে?

দুর্গা বলে, কেন, কালীদা থাকবে।

—কালীদা! এমন একটা শব্দ করিয়া উঠিল গোবর্ধন, যেন নতুন মাকে দুর্গা হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিতেছে।

—বলছো কি তুমি! ওর চেয়ে একটা কুকুর-বেরালের জিম্মায় রেখে গেলেও যে অনেকটা নিশ্চিন্দি হওয়া যায়।

—কি করতে চাও?

—সেই কথাই তো জিগগেস করছি।...আমি তো বলি বাপু, চলুন উনি আমাদের সঙ্গে। কি বলো!

—তা উনি কি রাজী হবেন!

—গররাজী হবার যে কি আছে এতে তাও তো [illegible]ম বুঝতে পারি না। আর রাজী না হয়েই বা যাবেন কোথায়। এখানে এই অবস্থায় কে ওঁকে দেখবে শুনি! অবিশ্যি উনি যদি বলেন যে, না, স্বামীর ভিটে ছেড়ে আমি এক পা-ও নড়বো না, সে আলাদা কথা।

আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দুর্গা বলে, তা বেশ তো উনি যদি স্বেচ্ছায় যেতে রাজী হন তো যাবেন। আমি কি আর আপত্তি করবো!

সঙ্গে-সঙ্গে গোবর্ধন বলে, আর তোমারও বেশ একজন সঙ্গী হবে। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত নিরস্থু একলাটি আর তোমাকে আমার পথ চেয়ে বসে থাকতে হবে না। বেশ হবে, কেমন!

দুর্গার কোনো সাড়া নাই। হয় তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এতক্ষণ। গোবর্ধনের চোখে ঘুম নাই। এক লাটাই চিন্তার সূতা যেন তাহার অপরিসর মাথাটার মধ্যে জট পাকাইয়া গিয়াছে।

আর জাগিয়া থাকে মালিনী। শুইয়াছে সেই কখন, অথচ এত রাত হইয়া গেল ইহার মধ্যে দুই চোখের পাতা এক করিতে পারিল না। থাকিয়া থাকিয়া একটু তন্দ্রার ঢল আসে কি অমনি কালীচরণের আড়বাঁশি বাজিয়া ওঠে। মালিনী আর ঘুমাইতে পারে না। শুইয়া-শুইয়া মনের গহনে শুধু বাঁশির সুরের রেশ টানিয়া চলে।

মালিনী ভাবে, কালীচরণের বাঁশি বাজাইবার ভানা হয় না। অন্য সময় হইলে মালিনী তাহাকে 'পরাণ বঁধুয়া' গানটি বাজাইতে বলিত।

দূরে নিবারণ চৌকিদারের হাঁক শোনা যায়—চেতন!

রাত অনেক হইয়াছে তাহা হইলে। মালিনী ভাবে, এইবার কালীচরণ শুইয়া পড়ুক। আর রাত জাগিলে হয় তো তাহার একটা অসুখ-বিসুখ হইয়া পড়িবে।

কালীচরণের ঘরে কিন্তু তখনও আলো নেভে না। আড়বাঁশি

ছাড়িয়া হয় তো আবার খাতাপত্র লইয়া বসিয়াছে কৃষক-সমিতির।

একটু পরে নির্জন লিচু গাছতলায় ঠক করিয়া লাঠির শব্দ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে অতি পরিচিত কণ্ঠের নিত্য-নৈমিত্তিক জিজ্ঞাসা—চেতন নাকি ঠাকুর!

নিবারণ আসিয়াছে।

তন্দ্রাহত শতনামপুরের একমাত্র জাগ্রত প্রহরী।

ইহাকেই বলে চৌকিদারী। একটু আগেই না হাঁক শোনা গেল সেই কত দূরে! দেখিতে না দেখিতে একেবারে দুয়ারে আসিয়া হাজির হইয়াছে নিবারণ।

নিবারণ আসে, বসে, তামাক খায় আর ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা পাড়ে। বলে দুরূহ জীবনযাত্রার কথা—নুন আনিতে না আনিতে কি ভাবে পান্তা ফুরাইতেছে, সেই কথা। আর বলে অসুস্থ মেয়ে রত্নার কথা, ও অসুখ সারবার নয় বুঝলে দাঠাউর। হরেন ডাক্তার তো 'জব' দিয়ে গেল আজ।... বললেন কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে নিবারণ, তুমি বরং বড় ডাক্তার দেখাও। কলিকায় একটানা কয়েকটা ফুঁ দিয়া নিবারণ হতাশ ভাবে বলে, ওরও কিছু ছিল ভোগান্তিক অদৃষ্টে আর আমারও। কর্মগতিকে কিছু দণ্ড দেবার ছিল, দিয়ে গেলাম।

কলিকার আগুনে ফুঁ দিবার সময় নিবারণের কালো ঠোঁট

ভুইখানি লাল হইয়া থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপে। বুক ভাঙ্গিয়া দুই চোখ ভরিয়া আসে জল। রম্ভা বুঝি আর বাঁচিবে না।

কালীচরণ বলে, তা বড় ডাক্তার ডাকতে বললেই যে বাঁচবে না তোমার মেয়ে, এ কথা তুমি ভাবছো কেন? হরেন ডাক্তার 'জব' দিয়ে গেল তো কি হলো!

কালীচরণের হাতে হুঁকা আগাইয়া দিয়া নিবারণ জোর করিয়া একটু হাসি টানিয়া বলে, না, কি আর হবে, তাই বলছি। ধরো, খাও আমি উঠি।

একটু পরেই দূর হইতে নিবারণের হাঁক শোনা যায়, চেতন!

নিশুতি রাত। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নাই। স্বর্গমর্ত্য ব্যবধানের মাঝখানে নিস্তরঙ্গ কালো সমুদ্রের উপর দিয়া কথাটি যেন কোন সুদূরে মিশাইয়া যায়।

সাত

নাছোড়বান্দা গোবর্ধনের সহিত তর্ক কারতে াগয়াই মালিনী অবশেষে মস্ত ভুল করিয়া বসিল। মালিনী অবশ্য ঠিক তর্ক করে নাই ; গোবর্ধনের সুযৌক্তিক বিতর্কের মধ্যে মাঝে মাঝে নেহাৎ মেয়েমানুষের মতোই নিজ স্বাধীন মন্তব্য গুঁজিয়া দিতেছিল। কিন্তু বক্তব্যের পারম্পর্য রক্ষা করিয়া যে স্তরে গোবর্ধনের সওয়াল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল সেখানে মালিনীর মন্তব্য তুচ্ছ একটা কুটার মতো দুই একবার ঘুরপাক খাইয়া কোন অতলে তলাইয়া যাইতেছিল। 'তা সত্যি' বলা ভিন্ন মালিনী যেন আর কোনো কথাই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। গোবর্ধন বলে, তবে—তবে কলকাতা যেতে আপনার এত আপত্তি কেন। অবিশ্যি আমাদের দিক থেকে কোনো দায়িত্ব না থাকলে, আর দায়িত্বের কথাই বা বলি কেন, এ তো আমাদের দাবি। আপনার দিক থেকে কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন ফুরিয়ে থাকলেও আমরা তো আর এখনই অভিভাবকহীন হয়ে পড়তে চাই না! ভেবে দেখুন, আমি তো থাকি সারাদিন বাইরে-বাইরে, আর চোপর দিনটা আপনার মেয়েকে ঐ

একলাটি বসে থাকতে হয়। চাকর বামুন অবিশ্যি থাকেই কিন্তু হাজার হলেও ছেলেমানুষ তো! সংসারের ও কতটুকখানি বোঝে বলুন দেখি!

মালিনী কি উত্তর দিবে এ কথার! চিন্তাগ্রস্তের ন্যায় মালিনী শুধু অধোমুখে বসিয়া মেঝের উপর তর্জনী বুলাইয়া যায়।

দুর্গা এতক্ষণ তক্তাপোশের এককোণে চুপ করিয়া বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে 'উল' বুনিয়া যাইতেছিল। মালিনীর পক্ষ হইতে কোনোরূপ উত্তর না পাইয়া বলিয়া উঠিল, তা এত করে বলছেন—চলই না বাপু একবারটি। আবার না হয় ফিরে এসো দু-দিন বাদে।

হঠাৎ মালিনী অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া ওঠে, আচ্ছা দেখি একবার শুনে-মেলে।

দুর্গা অভিমানের সুরে বলে, শুনে-মেলে মানে কালীদার কাছে জিগগেস করবে তো! তা শুধু কালীদাই হলো গিয়ে তোমার আপনার জন, আর—আমরা কি কেউই না!

মালিনী গোবর্ধনের প্রতি এক নিমেষ চাহিয়া মোলায়েম সুরে বলে, না, মানে একবারটি শুধু জিগগেস করবো। তাকেও তো আবার এখানে হাত পুড়িয়ে খেতে হবে!

কালীচরণের প্রসঙ্গে কথাগুলি মালিনীর কণ্ঠ হইতে যেন হঠাৎ ব্যথার সুরে উপচাইয়া পড়ে।

গোবর্ধন বলে, তা কালীবাবুও না হয় আমাদের সঙ্গেই চলুন,

ক'দিন থেকে উনি না হয় ফিরে আসবেন। আপনি থেকে যাবেন! কি বলেন?

মালিনী সংক্ষিপ্ত উত্তর করে, দেখি ব'লে।

গোবর্ধন বলে, আবার বলাবলি কি, ওই ঠিক রইল।

হঠাৎ আলোচনার মোড় ঘুরাইয়া দিয়া মালিনী একটু বিস্মিতের সুরে বলিয়া ওঠে, ওমা বেলা যে একেবারে পড়ে এল দুর্গা। না, মেয়েকে নিয়ে আর পারবার যো নেই। আর আমারও যদি ছাই কিছু মনে থাকে। এতক্ষণ কবে চুল বাঁধা হয়ে যেত। শিগগির নিয়ে আয় চুলের ফিতে কাঁটা।

প্রসাধনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া দুর্গা সুগন্ধি এলো চুলের গোছা দুই হাতে পাকাইয়া খোঁপা বাঁধিতে-বাঁধিতে বৈরাগ্যের সুরে বলে, থাকগে—আজ আর চুল না-ই বাঁধলাম! স্বহস্তরচিত এলো খোঁপার উপর মৃদু করাঘাত করিয়া বলে, এই তো বেশ আছে।

অভিভাবকের সুরে মালিনী বলে, শোনো মেয়ের কথা! থাকগে বই কি! শেষকালে মাথায় জল ব'সে একটা অসুখ-বিসুখ করুক!

দুর্গা অনুনাসিক সুরে কৃত্রিম প্রতিবাদ জানাইয়া চুল-বাঁধার ফিতে কাঁটা আনিতে চলিয়া যায়।

একটু পরেই সান্ধ্যভ্রমণের পোশাকে সজ্জিত হইয়া গোবর্ধন মালিনীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, আচ্ছা তা হলে গাঁয়ের

ভেতরটা দিয়ে আমি একটু ঘুরে আসি! বেশ লাগে। আবার কবে আসা হয় না হয়।

—সে কী কথা! এখনও যে চা হলো না—দুর্গার চুলের বেণী ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় মালিনী।

ভবিষ্যৎ জীবনে গোবর্ধনের যকৃৎ খারাপ হইবার আশঙ্কা করিয়া দুর্গা গোবর্ধনের চা পানের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানায়—বলে, আচ্ছা এই না বেলা তিনটের সময় একবার চা খেলে, আবার এখুনি তোমার চায়ের তেষ্টা পেল! না, কক্ষনো তুমি চা খেতে পাবে না।

—আ গেল যা, আমি কি চা খেতে চাইছি নাকি! আচ্ছা মুশকিল যা হোক।

—না, তা চাইবে কেন! কি সাধু পুরুষ আমার! বেশ, না চেয়েছো না চেয়েছো। এখন যাও যেখানে যাচ্ছ।

মালিনী একটু মুচকি হাসিয়া বলে, থাক, শাসন করতে হয় পরে কোরো। এখন থামো তো গিন্নীঠাকরুণ! তা চা যেন না খাওয়া হলো, তাই বলে অন্তত শুধু মুখে···কিছু তো মুখে দিয়ে বেরুতে হয়!

গোবর্ধন হাত তুলিয়া বলে, আপনি কেন অত খামাখা ব্যস্ত হচ্ছেন বলুন তো।

—খামাখা বই কি! খাওয়া হয়েছে বলে সেই কোন সকালে! আর এ দিকে খেতে খেতে তো রাত্তির দশটার এধারে

নয়! একটু কিছু মুখে না দিয়ে গেলে চলবে কেন! তোমরা একটু বসে গল্প কর, আমি চট করে এই ফাঁকে দুখানা লুচি ভেজে আনি। কতক্ষণ লাগবে, এক্ষুনি হয়ে যাবে।

—কি মুশকিল। হয়ে তো যাবে বুঝলুম কিন্তু খাবে কে বলুন তো। সত্যি বলছি আমার একটুও ক্ষিদে নেই; বিশ্বাস করুন। আর আপনার কিছু-টিছুর [illegible]রের সঙ্গে আমি তো একেবারে অপরিচিত নই। রাত্রের খাওয়াটা মিছিমিছি মাঠে মারা যাবে। তার চেয়ে খানিকটা হেঁটে ক্ষিদেটা আমি বরং বাড়িয়ে আনি।

—খেতে রাত হবে, ক্ষিদে পেলে কিন্তু আমার দোষ নেই।

—তাতে আমার ইষ্ট ছাড়া অনিষ্টের কোনো আশঙ্কা নেই। যত রাতই করুন না কেন!

প্রসন্ন চিত্তে মুখে হাসি টানিয়া দরদালান দিয়া বাহির হইয়া যায় গোবর্ধন।

কেশ-প্রসাধন করিবার সময় চুলে টান খাইয়া দুর্গা যে কতরকম মুখভঙ্গী করে! চুলের জট ছাড়াইবার সময় দুর্গা মুখটা এমন বিশ্রী অথচ করুণ করে যে দেখিলে মায়া হয়। উপরের ঠোঁটের পাশের দিকটায় এমন সুন্দর একটা খাঁজ পড়ে যে, দুর্গার মুখের উপর সারা বাংলাদেশের তরুণী মেয়েদের কোমল একটা মুখশ্রী মুহূর্তের জন্য ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যায়। সুবাসিত নারিকেল তেলের মৃদু গন্ধে মনটাকে যেন বেপরোয়াভাবে ঘোর সংসারী করিয়া তোলে, সুগন্ধি চুলের সুবাসে বেণীদুলানো

উচল খোঁপা, এলোখোঁপা, তোলাখোঁপা, বেলকুঁড়ি খোঁপা, বাঁধা খোঁপা, অনেকগুলি মুখ মুহূর্তে স্মৃতিপথে ভিড় করিয়া আসে। এমন সুন্দর কমনীয় সব মুখ! শতনামপুরের সবটুকু সৌন্দর্য ইহারা যেন নিংড়াইয়া লইয়াছে। কতকগুলি মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা হয়, আবার কতকগুলি মুখ দেখিলেই মনের মধ্যে অভিমানটা অকারণে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে। এত চেনা এত আপন মনে হয়! এক অপার্থিব করুণ বেদনায় মনটা টন টন করিয়া ওঠে।

আট

সন্ধ্যাবেলা। পুরাতন রঙচটা হ্যারিকেনটায় মজুত কেরোসিন তেলের পরিমাণ অনুমান করিবার নিমিত্ত লণ্ঠনটিকে স্বকর্ণরন্ধ্রের নিকট আন্দোলিত করিতে করিতে কালীচরণ মালিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলে, কেরোসিন তেলের বোতলটা কোথায় রাখা হয়েছে বলা হোক।

—আচ্ছা লণ্ঠনটা আমার কাছেই দেওয়া হোক: কালীচরণের কথা বলার ঢঙটা নকল করিয়া মালিনী উত্তর করে।

—থাক, আর সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

সোজা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া কালীচরণ মাচার তলা হইতে কেরোসিন তেলের বোতল টানিয়া বাহির করিয়া লণ্ঠনে তেল ঢালিতে বসে।

—থাক আর কাজ দেখাতে হবে না: মালিনী কালীচরণকে আর একবার এই নিতান্ত সাংসারিক খুঁটিনাটি কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তদুত্তরে: ভাত হয়ে থাকে তো দেওয়া হোক, আমি এখনই বাইরে যাব—

এই কথা শুনিয়া মালিনী মুখে কাপড় দিয়া হতভম্বের মতো ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় মালিনী কৃত্রিম অনুনয়ের সুরে বলে, কোথায় যাওয়া হবে বাবুর জিগগেস করতে পারি কি ?

দ্বিরুক্তি না করিয়া কালীচরণ উত্তর করে : নিবারণের মেয়েটার খুব অসুখ। এখন-তখন অবস্থা। কাল রাত্রে এসেছিল। আজ আবার বাজারে দেখা। অনেক করে যেতে বলেছে। ঘরে তো একটা ফুটো আধলাও নেই যে, মেয়েটার চিকিৎসা করে। এদিকে আমি গিয়েই বা যে কি করব তাও তো কিছু বুঝিনে।

ওমা, সে কি কথা! বিস্মিতের সুরে মালিনী বলে, এই তো সেদিনও দেখলাম, বটতলার পুকুরে মায়ের সঙ্গে নাইতে এসেছে রত্না।

কালীচরণ বলিয়া যায়, গরীব লোক। প্রথমে তো ডাক্তারই দেখায়নি। এদিকে স্নানও করেছে ভাতও খেয়েছে। এখন হয়ে পড়েছে খারাপ। নিবারণের মুখেই শুনলাম, হরেন ডাক্তার নাকি জবাব দিয়ে গিয়েছে। কাল দেখালাম আমি ডাক্তারকে দিয়ে ; বললে তো টাইফয়েড।

মালিনী অসহায়ভাবে বলে, কি কাণ্ড! তা তুমি যখন এখনই যাচ্ছ তখন ফিরে এসেই না হয় খেয়ো'খন। রান্নার তো এখনও কিছুই হয়নি। সবে ভাত নাবিয়ে ডাল চড়ালাম। কি বলো ?

কালীচরণ আর কোনো উত্তর করে না। হন হন করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চলিয়া যায়।

পিছন হইতে মালিনী কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিতের স্বরে বলে, কি—কিছু বললে না যে! ফিরবে তো রাত্তিরে, না-কি?

রঙ্গীন ছিটের হাফসার্টটা গায়ে দিয়া কালীচরণ তাহার প্রিয় সুপারি গাছের লাঠি ও রঙচটা লণ্ঠনটা ঝুলাইতে ঝুলাইতে মণ্ডপঘরের বাহির হইয়া আসে।

মালিনী একটু আগাইয়া প্রশ্ন করে, কি কিছু বললে না যে, ফিরবে তো রাত্তিরে!

অন্যমনস্ক ভাবে শুধু একটা উ-শব্দ করিয়া কালীচরণ পাতলা অন্ধকারে লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিয়া লণ্ঠনের কল ঘুরাইয়া পলিতা উস্‌কাইয়া দেয়।

কালীচরণের চৌকস কালো মুখখানার দিকে তাকাইয়া মালিনী মিনতির স্বরে বলে, তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু লক্ষ্মীটি!

উ—হুঁ: মালিনীর কথার উত্তরে কালীচরণ শুধু এইটুকু সংক্ষিপ্ত উত্তর করিয়া পথ ধরে।

রঙচটা হ্যারিকেন লণ্ঠনটার স্তিমিত লাল আলো যে-পর্যন্ত না জেলাবোর্ডের রাস্তার বাঁকে মিলাইয়া যায় মালিনী ততক্ষণ ঐ অন্ধকারে মুখে কাপড় দিয়া চিত্রার্পিতের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া থাকে।

কালীচরণ নিবারণের বাড়ি আসে বাজার ঘুরিয়া। কথায় কথায়

নিবারণ বলিয়াছিল, এট্টা নেবু নেবু করে মেয়েটা ছটফট করে। তা যা দর! জোড়া চায় দশ পয়সা। অত পয়সা পাব কোথা থেকে।

বাজারে ঢুকিয়াই প্রথমে কালীচরণ বটতলার ফলওয়ালার দোকান হইতে তুইটা কমলা নেবু ও একটি বেদানা কিনিয়া নেয়। কালীচরণ ভাবে, টাইফয়েডের রোগী খায় শটির বার্লি। তাও আবার বেনেতি দোকান হইতে খুচরা তুই এক পয়সার কেনা। কত কি ভেজাল দেয় দোকানী ওতে তার ঠিক কি। নিবারণের যদি কোনো একটা আক্কেল থাকে! কেন, দশ বারো আনা খরচ করিয়া ছোট এক কৌটা বার্লি কিনিয়া লইলেই পারে! মনিডাক্তারই তো বলে, বার্লি খুব বলকারক। পথ্য ও ঔষধ তুইটারই কাজ করে। না—এক সঙ্গে ঐ কয়েক আনার পয়সাই তাহার জোটে না। বেটা আবার নেশা করে। হইতেও পারে। নগদ বারো আনা পয়সা দিয়া দত্তর দোকান হইতে কালীচরণ ছোট এক কৌটা বার্লি কেনে।

দত্তর দোকানের পাশেই তেওয়ারির মনমোহিনী বিড়ির দোকান। শত-শত বাণ্ডিল তারের জালের উপর সারবন্দী ভাবে সাজাইয়া কয়লার আঁচে সেঁকা হইতেছে। আর মিনিট কয়েক পরেই সমস্ত বিড়িগুলির মুখ আগুনের আঁচে কালো হইয়া উঠিবে। আর অমনি তেওয়ারি বাণ্ডিলগুলিকে পাতলা

লাল কাগজে মুড়িয়া লালকালীতে ছাপার অক্ষরে লেখা 'মুখ পোড়া মনমোহিনী বিড়ি স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়'—এই শীল মারিয়া কেরোসিন কাঠের শাদা সেলফের উপর স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিবে। প্রত্যেকটি বাণ্ডিলের দাম লইবে ছয় পয়সা আর বলিবে—এক কলিকাতা ভিন্ন এইরূপ ভালো বিড়ি আর কোথাও মিলিবে না।

কেমন একটা সোঁদা মিষ্টি গন্ধ কালীচরণের মুখ তেওয়ারির দোকানের দিকে ঘুরাইয়া দেয়। অজগর সাপের মতো অমনি তেওয়ারি খরিদ্দার-কালীচরণকে দূর হইতে দৃষ্টি দিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে। মৃদু মৃদু হাসে আর ভাঙ্গা বাংলায় বলে, লিবেন নাকি বাবু এক বাণ্ডিল। একদম তাজাওয়ালা।

বিমুগ্ধ শিকারের মতো কালীচরণ তেওয়ারির দোকানের দিকে আগাইতে থাকে দু-এক পা করিয়া।

বাঁশের মাচার উপর হইতে তেওয়ারি এক লাফে নিচে পড়িয়া তারের জালের উপর হইতে এক বাণ্ডিল বিড়ি পরীক্ষার ছলে আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া কালীচরণের হাতে তুলিয়া দেয়।

কালীচরণ কোনো প্রকার মন্তব্য করার পূর্বেই তেওয়ারি বলিয়া ওঠে, এক দিনকা কারবার নেহি হ্যায় বাবুজি, হাঁ।

কালীচরণ জানে যে, তেওয়ারির দোকানের বিড়ি মোটের উপর মন্দ নয়, তাই সে আর ইতস্তত না করিয়া ছয়টা পয়সা তেওয়ারির হাতে তুলিয়া দেয়।

লব্ধ অর্থ প্রথমে সিদ্ধিদাতা গনেশের পাদমূলে ঠেকাইয়া এবং পরে ক্যাসবাক্স ও নিজকপালে উপর্যুপরি বারকয়েক স্পর্শ করাইয়া তেওয়ারি এক-একটি করিয়া পয়সা কয়টা দারুময় পেটিকার রন্ধ্রপথে চালান করিয়া দিয়া কালীচরণকে বিদায় সূচক সম্বর্ধনা জানাইয়া বলে, রাম রাম! তদুত্তরে কালীচরণও অনুরূপ ধ্বনি করিয়া বিদায় নেয়।

বাজারের উপরেই মনিডাক্তারের ডিসপেন্সারি। কালীচরণ ভাবে, ডাক্তারখানাটা একবার ঘুরিয়া যাই; দেখি—মনিডাক্তার কি বলে। কিন্তু ডাক্তারখানার সম্মুখে আসিতেই দেখা গেল, মনিডাক্তারের বসিবার বার্নিশ করা লাল চেয়ারখানা শূন্য পড়িয়া আছে। হয় তো বা কোথাও কল্‌-এ বাহির হইয়া গিয়া থাকিবে। মনিডাক্তারের কি এক দণ্ডও ফুরসুত আছে! হাতযশটা দেখিতে হইবে তো!

বাজারের উপর কালীচরণকে আন্দাজ করিয়া পেট্রোম্যাক্সের আলো হাত দিয়া আড়াল করিয়া যদু ময়রা ডাকিল, ও কেডা যায়! দাদু না! এসো এক কলকে ভালো করে সাজি।

কালীচরণ হাসিয়া বলে, না দাদা এখন থাক। বরং ফেরবার পথে আসব'খন। দোকান খোলা থাকবে তো?

বৃদ্ধ যদু ময়রা কাঠের টুলটার উপর নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলে, তা দেড়মণ সন্দেশের কাজ! রাত তিনটের এ ধারে তো দোকানের আলো নিভবে না।

ফেরবার পথে হয়ে যাবো'খন : কালীচরণ সোজা নিবারণের বাড়ির পথ ধরে।

মাধব দাসের বাড়ি খোল বাজিতেছে। এতদূর হইতেও কালী-চরণ খোলের বোলগুলি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে। বাজাইতেছে বোধ হয় মাধব দাসের সম্বন্ধী কেষ্ট। ঐ তো ধরণীর গলা শোনা যাইতেছে না !—কি কহসি কি পুছসি।···পদাবলী কীর্তন ধরণী মন্দ আয়ত্ত করে নাই। দোয়ারীতে সরু গলাটা বোধ হয় তারাপদর। অন্ধকার পথে তারাপদর কথা মনে পড়িয়া কালী-চরণের হাসি পায়। বেচারী তারাপদ ! গিটকিরি ওর আসে না তবু গিটকিরি দিয়া গাহিতে গিয়া মিছে লোক হাসায়। ছোঃ ! পুরুষ মানুষের অত সরু গলাও হয় !

সহসা কালীচরণের কানে ভাসিয়া আসে : ওরে ওরে দুরাচার পাষণ্ড পামর ! স্পর্ধা তোর না পারি সাহিতে। সংযত কর এবে মিথ্যা তোর মুখর ভাষণ। নতুবা ইষ্টদেবে কররে স্মরণ ; বধি তোরে বন্য-জন্তু সম শরে শরে।···

পশ্চিম পাড়ার যদু-কৈবর্তের নাতি বিষ্ণুপদ পীরপুর যাত্রা ক্লাব হইতে রিহার্সাল দিয়া ফিরিতেছে ; পথে তাহারই মহড়া দিতেছে। পার্ট বিষ্ণুপদ মন্দ বলে না। ইতিপূর্বে তরণী সেনের পার্ট করিয়া বেশ নামও করিয়াছে কিন্তু উচ্চারণটা ওর কিছুতেই শোধরাইল না।

কালীচরণকে দেখিয়াই বিষ্ণুপদ তাহার পায়ের ধূলা লইয়া

বিস্মিতের সুরে বলে, আরে দাঠাকুর যে! তা কুশল তো! আজকাল যে বড় এট্টা দেখতে পাইনে। ক্লাবেও যাওয়া হয় না, বাজারেও দেখতে পাইনে। হাটখোলার আখড়াতেও শুনি এদানিক আর যান না, বলি আমাদের কি ভুলে গেলেন দাদা য়্যাঁ! কেন, কি অপরাধ করেচি।

স্মিত হাস্যে বিষ্ণুপদর কাঁধের উপর মৃদু করাঘাত করিয়া কালীচরণ বলে, ক্ষ্যাপা না পাগল! সময় পাই না তাই।

ব্যগ্রভাবে দুহাত জোড় করিয়া বিষ্ণুপদ অনুনয়ের সুরে বলে—তা দাদা এট্টা কথা আমার রাখতেই হবে। আজ হল সোমবার, তাহলে পড়ল গিয়ে তোমার সোমে সোমে আট-এই আর হপ্তার বুধ-বেস্পতি নাগাদ। যখন আপনার সুবিধে হয়! এট্টুখানি সময় করতেই হবে দাদা।

কালীচরণ বলে, কেন, মোশন মাস্টার তো তোমাদের একজন রয়েইছে; গুলুবাবু!

বিষ্ণুপদ বলে, হ্যাঁ আছেন, তবে ওঁকে ঠিক আমার পছন্দ হয় না। আপনি যেমন বলে দেবেন উনি কি আর তেমনটি পারবেন। আর এসব ভারি পার্টের মোশন ওঁর তেমন আসে না। আর আছে এক গণেশ মণ্ডল···

নামটি কালীচরণের চোখে মুখে অপরিচিতের মতো অস্পষ্ট হইয়া ওঠাতে বিষ্ণুপদ বলে, চিনলেন না, এই আপনার মধুখালির পরাণ মণ্ডল?

—ও চিনলাম এইবার।

—সে দিন রিহার্সালের সময় আখড়ায় এসেছিল ; আর বললে যে ও পার্ট তোমার গুলুবাবুকে দিয়ে সুবিধে হবে না। হ্যাঁ, তবে নাচ গানের মাস্টারের অসুবিধে এতকাল পরে গেছে। নাচে গানে উনি একেবারে এক্সপার্ট। এ কথা সকলেই মানবে। তবে ঐ ভারি পার্টে উনি তেমন সুবিধে করতে পারবেন না। আজ কদিন থেকে আপনার ওখানে যাব যাব করছি, তা সময় পাইনে। যাক দেখা হয়ে গেল আপনার সঙ্গে ভালোই হলো। তা কবে নাগাদ যাব বলুন! যখন আপনার সুবিধে হয়!

—আচ্ছাঃ, যেও একদিন।···আর না হয় আমিই একদিন সময় করে যাব'থন আখড়ায়!

—সে কি সুবিধে হবে! আপনি আবার কষ্ট করে আসবেন! তার চেয়ে আমিই না হয় যেতাম। সকাল দুপুর রাত—যখন আপনার সুবিধে।

—আচ্ছা, তা হলে আজ হল গে তোমার সোমবার, মঙ্গলবার না বুধবারও না—বৃহস্পতিবার সকাল কিংবা দুপুরে।

—তাহলে দুপুরেই ; এই বেলা দেড়টা নাগাদ কি বলেন?

—আচ্ছা বেশ!

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বিষ্ণুপদ পিছন ফিরিয়া চেঁচাইয়া বলে, ভুলে যাবেন না যেন, দাদা!

রাস্তার মোড় হইতে কালীচরণকে বলিতে শোনা যায় : না না, তুমি সময় মতো এসো। আমি ঠিক থাকবো।
কালীচরণের শেষ কথাটি নিরেট অন্ধকারের প্রাচীরে ঘা খাইয়া ফিরিয়া আসে—থাকবো।
দূরে নিবারণের ঘরের মধ্যে যে কেরোসিন তেলের ডিবরিটা জ্বলিতেছে গাছগাছালির ফাঁক দিয়া কালীচরণ এখান হইতেই তাহার মলিন লাল শিখাটি দেখিতে পায়।
রত্নার রোগশীর্ণ পাংশু মুখখানি সহসা কালীচরণের চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে। মাসাধিককাল মারাত্মক টাইফয়েড রোগে ভুগিয়া রত্নার কি হালই না হইয়াছে! কোথায় গিয়াছে সেই শ্যামল ত্বকের মসৃণ চিক্কনতা, আর কোথায় বা গিয়াছে রত্নার ভাসা-ভাসা দুই ডাগর চোখে কৈশোরের বুনো চঞ্চলতা!
কাঁধের উপর দিয়া ছাপা জংলা শাড়ির আঁচলখানা ঘুরাইয়া আনিয়া রত্না যখন কটিদেশে আঁট করিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া পাড়া বেড়াইতে বাহির হইত, সাংসারিক নানা কাজে উত্যক্ত নিবারণের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ কলাবতী তখন রত্নার দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিত, ধিঙ্গি মেয়ের খেমটা নাচন দেখে আর বাঁচি নে। আর ঘরে কুটো গাছ ভেঙ্গে দুখানা করতে বললেই কি মেয়ের মুখে অমনি ত'লোহাঁড়ি নামল। দূর হয়ে যা সামনে থেকে মুখপুড়ি। মুহূর্তে একটা কাচের ঝাড় লণ্ঠন পাথরের মেঝের উপর পড়িয়া যেন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়—এমনই উদ্দাম

বেগে তখন রত্নার উচ্ছল হাসি ফাটিয়া পড়িত। ক্রোধোন্মত্ত নিবারণের বৌ কলাবতী তখন দাঁতে দাঁত চাপিয়া সম্মুখস্ত মুড়া সমার্জনীটা লইয়া রত্নার দিকে তাড়না করিয়া বলিত, আ মরন আঁটকুড়ির, দেব মুখে নুড়ো জ্বেলে!

আর হাসি নয়। অপমানাহতা রত্না তখন নিষ্কম্প দীপ শিখার মতই উদ্ধত সমার্জনীর মুখে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া টানিয়া টানিয়া শ্বাস লইত, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবায় জাগিত বিদ্রোহীর দৃপ্ত সাবধান-বাণী। একটু পরেই ডাগর চোখ দুইটিতে ভরিয়া আসিত জল। রত্নার সুচিক্কন গালের উপর দিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু মুক্তা ফলের মতো পিছলাইয়া পড়িত। সে এক অপূর্ব মূর্তি রত্নার। এ মূর্তি আকর্ষণও করে, আবার বিকর্ষনও করে। মারমুখী কলাবতী মুহূর্তের জন্য হাতের উদ্ধত সমার্জনীটা নামাইয়া লইত —ওষধির গন্ধে সাপ যেমন নাকি তাহার কুটিল ফণা গুটাইয়া নেয়, ঠিক তেমনিই। মা-বেটিতে তো এক দণ্ড বনি না: ছুত্‌নাছুতে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইত।

বাঁশের সাঁকোটা কোনোমতে পার হইয়া বাঁয়ে ঘুরিলেই সামনে পড়িবে নিবারণের বাড়ি। আর একটুখানি পথ। পা টিপিয়া বাঁশের সাঁকো পার হইবার সময় তালুতে জিব ঠেকাইয়া কালীচরণ বিরক্তিকর শব্দ করে আর ভাবে: আচ্ছা, জল শুকাইয়াছে তো সেই কোন অঘ্রান মাসে, বছর ঘুরিয়া আসিতে চলিল। সময় করিয়া নিবারণ কি একদিন সাঁকোটাও তুলিয়া

ফেলিতে পারে নাই! পচা দড়ি ছিঁড়িয়া কবে যে কাহার প্রানান্ত হইবে কে বলিবে! সর্ব কাজেই নিবারণের এমনধারা গাফিলতি। নয়নজলির জল কি আজ শুকাইয়াছে নাকি! সংসারটাও তো মজিল এই করিয়া। কোনো দিকে নিবারণের যদি খেয়াল থাকে।

লাঠি, লণ্ঠন, ফলের ঠোঙ্গা এবং মুখে জ্বলন্ত বিড়ি লইয়া কালীচরণ অতিকষ্টে সাঁকো পার হইয়া সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে। তারপর বাঁয়ে ঘুরিতেই নিবারণের বাড়ির পোষা মাদি কুকুরটা চিরাচরিত কর্তব্যবোধের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির এতটুকু হেরফের না করিয়া নেহাৎ ইতরের মতোই চেঁচাইয়া সারা গ্রাম মাথায় করিয়া তোলে। কুকুরের খবরদারী অগ্রাহ্য করিয়া কালীচরণ নিবারণের বাড়ির দিকে আরও খানিকটা আগাইয়া যায়। ভর্ৎসনার সুরে বলে, এও চোপরাও! শাসন ব্যর্থ হইল। এবার কুকুরটা আরও বেয়াড়া ভাবে ইতস্তত আগু পাছু করিয়া টানিয়া চেঁচাইতে থাকে। ভর্ৎসনা ছাড়িয়া কালীচরণ এবার অন্য পন্থা ধরে। তালু ও জিব সংযোগে সোহাগের শব্দ করিয়া কালীচরণ আদর করিয়া ডাকে, সুন্দরী —সুন্দরী! আশ্চর্য! এত তর্জন-গর্জন নিমেষে জল হইয়া গেল। মাথার দুই পাশ দিয়া খাড়া কান দুইটাকে নোয়াইয়া পুষ্ট দেহটিকে নৃত্যের ভঙ্গীতে আন্দোলিত করিতে করিতে এবার সুন্দরী আগাইয়া আসে এবং দ্রুত পুচ্ছতাড়নায়

কালীচরণের আত্মীয়তাকে যথার্থভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া আগন্তুকের পদযুগল লেহন করিতে করিতে গোঙাইতে আরম্ভ করে।

আভূমি নত হইয়া কালীচরণ সুন্দরীর মাথার উপর মৃদু করাঘাত করিয়া বলে, থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে। কালীচরণ ভাবে, পোষা বিড়ালটি মরিয়া গেলে মালিনী দুই দিন কিছু খাইতে পারে নাই। বাস্তবিক, জীবজন্তু এত মায়াও জানে!

সাড়াশব্দে নিবারণ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে। অন্ধকারের মধ্যে আগন্তুককে নিবারণ ঠিক চিনিতে পারে না। আন্দাজে ঠাহর করিয়া বলে, বলরাম ফিরলে নাকি!

—কেন বলরামকে আবার এতরাত্রে পাঠালে কোথায়? কালীচরণ বলে।

—আরে দাঠাকুর যে দেখি! আপনার সন্ধানেই তো পাঠালাম! ভাবলাম বলি এই অন্ধকার রাত, একলা আসবেন, তাই বললাম বলি, যা এগিয়ে নিয়ে আয়গে। বসেই তো ছিল, তা মাঝ পথে আপনার সঙ্গে তো দেখা হওয়ার কথা; গেল কোন পথ ধরে!

—দেখদিনি কি কাণ্ডটা বাধালে। না পাঠালেই হতো! আমি কি আর এই প্রথম আসছি! এখন এই অন্ধকারে বেচারী··· যাক, এখন রুগী কেমন?

নিবারণ মাথা চুলকাইয়া মুখটা কাঁচুমাচু করিয়া বলে, এই তো এতক্ষণ কেবল এপাশ আর ওপাশ, আর কি সব ছাইপাঁশ

বিড়বিড় করে বলে বুঝতেও পারি নে। এই সবে মাত্র একটু চোখ বুজেছে।

ফলের ঠোঙাটা কালীচরণ নিবারণের হাতে দিয়া বলে, এখন কাছে আছে কে?

—ওর মা বাতাস দিচ্ছে।

পকেট হইতে বার্লির কৌটা আর দুইটা কমলানেবু বাহির করিয়া কালীচরণ নিবারণের হাতে দিয়া বলে, এই যে, রত্নাকে দিও।

—তা এসব আবার তুমি কষ্ট করে আনতে গেলে কেন দাঠাকুর!

—না, ঐ যে বিড়ি কিনতে যাচ্ছিলাম! সামনে দেখে কিনে ফেললাম। দেখদিনি এট্টা বিড়ি খেয়ে। বললে তো বড় ভালো বিড়ি।

পকেট হইতে মুখপোড়া মনমোহিনী বিড়ির বাণ্ডিলটা খুলিয়া কালীচরণ একটা বিড়ি নিজ দাঁতে চাপিয়া ধরে—আর একটি নিবারণের দিকে আগাইয়া দেয়; বলে—দেশলাই আছে? তারপর নিজ পকেটেই দেশলাই-এর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া বলে, না থাক, এই যে আমার কাছেই রয়েছে। ঘরের ভিতর একবার উঁকি দিয়া কালীচরণ একটা বিড়ি ধরাইয়া বসিল।

হাঁটু দুইখানি দুই হাতে বেড়িয়া কালীচরণ অন্যমনে বিড়ি টানে। হঠাৎ নিবারণকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া বলে, লাল

মিক্‌চারটা দুপুরবেলা মনে করে খাইয়েছিলি তো? নিবারণ 'হু' বলিলে কালীচরণ আবার পূর্ববৎ গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবিতে বসে।

নিবারণ ভাবে, লাল ঔষধটার উপরেই হয়তো রত্নার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। ব্যস্তভাবে সে প্রশ্ন করে, লাল ওষুধটা আর এক দাগ এখন খাওয়াব নাকি?

—এখন! কেন? দুপুরবেলা এক দাগ খাওয়াও নি!

—হ্যাঁ, বেলা তিনটে নাগাদ এক দাগ দিইছি তো!

—তবে তা হলেই তো হলো। খাবে তো মাত্র দু'দাগ; সকালে আর দুপুরে! তাই না?

—হ্যাঁ।

নিবারণের কি রকম যেন গোলমাল হইয়া যায়।

একটু পরে কালীচরণ জামার বুক পকেট হইতে কালো কারে বাঁধা ঘড়িটা টানিয়া বাহির করে। তারপর লণ্ঠনের ফিতা উস্কাইয়া ঘড়ি দেখিয়া বলে, তার চেয়ে বরং একটা পুরিয়া দাও গে এই সময়, বুঝলে নিবারণ! পুরিয়া, শাদা পুরিয়া আছে না?

নিবারণ মাথা নাড়ে।

—জলে না গুলে, ঐ নেবুর রসের সঙ্গে গুলেই খাইয়ে দাও। রত্নার মাথার কাছে শুশ্রূষারত কলাবতীকে শুনাইয়া বলে, বুঝলে বৌমা!

ঘোমটা সমেত কলাবতীর মাথাটা দুলিয়া ওঠে।

কালীচরণ বলে, এখনও তো ঘুমুচ্ছে, না! তা হলে মিনিট দশেক পরেই দিও'খন!

শুশ্রূষারত কলাবতী তালপাখাখানা লইয়া ঘুমন্ত রত্নার মাথায় আবার বাতাস দিয়া যায়।

সুস্থ থাকিতে কলাবতী রত্নাকে কত না গালমন্দ করিয়াছে। রত্নার রোগশীর্ণ পাংশু মুখের দিকে তাকাইয়া কলাবতীর মন তাই আজ দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া যায়।

পাখার বাতাস লাগিয়া দুই একটি রুক্ষচুল রত্নার মুখের উপর উড়িয়া আসিয়া পড়ে। অশ্রুসজল নয়নে কলাবতী আলগোছে রত্নার মুখের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া দেয়।

চোখের জল আঁচলে মুছিয়া মনে মনে বলে, কাঁদিয়া অমঙ্গল ডাকিয়া আনি কেন! মেয়ে আমার নিশ্চয়ই সারিয়া উঠিবে। মনিডাক্তারই তো আজ সকালে বলিয়া গিয়াছে। হরি ঠাকুর রত্নার অসুখ ভালো করিয়া দাও, আমি তোমায় সোয়া পাঁচ আনার ডালা দেব।

রাতের পর রাত জাগিয়া নিবারণের শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দুটি হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া নিবারণ দাওয়ার উপর বসিয়া বসিয়া শুধু ঝিমায়। কখনো-কখনো কাল্পনিক প্রশ্নের জবাবে নিবারণ উঁ শব্দ করিয়া স্তিমিত লাল চক্ষুদ্বয় শূন্যে তুলিয়া ধরে। কেহ কোনো জবাব দেয় না।

কালীচরণ বলে, কিছু বলছিলে নাকি নিবারণ!

—না, কিছু না। নিবারণ আবার তাহার মাথাটা দুই হাঁটুর মধ্যে গুঁজিয়া দেয়।

হঠাৎ একটি ক্ষীণ করুণ আর্তস্বর কালীচরণকে সচকিত করিয়া তোলে। ত্রস্তপদে কালীচরণ রোগিণীর ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া কলাবতীকে বলে, রত্না জাগল নাকি বৌমা!

ঘোমটাবৃত মাথাটা আন্দোলিত করিয়া কলাবতী উঠিয়া দাঁড়ায়। কালীচরণ কলাবতীকে বলে, আচ্ছা আমি এবার একটু বসছি, তুমি বরং সেই ওষুধটা তৈরি করে আন, কেমন!

সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া রত্না এতক্ষণে কালীচরণের মুখের দিকে তাকায়।

মরা হরিণের চোখের মতো সারা মুখে রত্নার শুধু দুইটি বড় বড় শাদা চোখ! রত্নার রোগশীর্ণ মুখখানির উপর ঝুঁকিয়া কালীচরণ মৃদু হাসিয়া বলে, কি রে রত্না, কি, খিদে পেয়েছে।

রত্না কোনো জবাব দেয় না। ইতস্তত অবিশ্বাসীর দৃষ্টি ফেলিয়া সে যেন কাহার সন্ধান করে।

কালীচরণ বৃথাই রত্নার উদ্বেগের কারণ নির্ণয়ের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া বলে, কি মা জল দেব!

উত্তর নাই। রত্নার দুই চক্ষু ছাপাইয়া কয়েক ফোঁটা জল মলিন বালিশের উপর গড়াইয়া পড়ে। তাহার উধাও দৃষ্টি বাহিরে নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে যেন কাহাকে সন্ধান করিয়া ফেরে।

কপাল ঘামিয়া নাসিকা ও বিবর্ণ ওষ্ঠ দ্রুত স্পন্দিত হইতে থাকে। কি যেন বলিতে চায় অথচ বলিতে পারে না।

—বৌমা শোনো তো একবার! রত্না কি যেন বলছে।

কালীচরণ উদ্বিগ্নভাবে রত্নার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করে, কিছু বলবে! কি বলবে বল! মায়ের কাছে বলবে? সমস্ত প্রাণশক্তি সংহত করিয়াও রত্না যেন কথাটি কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারে না। ঠোঁটদুটি সে যে কত ভাবে বাঁকাইয়া কথাটি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে!

কালীচরণ ভাবে, মুখের মধ্যে জিভটি বোধ হয় রত্নার অবশ হইয়া গিয়াছে, তাই কথাটি সে কিছুতেই আয়ত্তে আনিতে পারিতেছে না।

গভীর মনোযোগের সহিত কালীচরণ রত্নার কথাটি অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কারণ কথাটি বলা না হইলে রত্নাও হয়তো নিরস্ত হইবে না।

কিছুক্ষণ অভিনিবেশের পর কালীচরণ বুঝিল যে, রত্না 'বলো-বলো' করিয়া কি যেন একটা কথা উচ্চারণ করিবার প্রয়াস পাইতেছে কিন্তু পূর্ণ কথাটি সে শত চেষ্টা করিয়াও পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না। 'বলো'—এই শব্দটি কান পাতিয়া থাকিলে ধরা যাইতেছে বটে কিন্তু বাকি কথাটুকু প্রতিবারই অনুচ্চারিত রহিয়া যাইতেছে। কথাটি কি হইতে পারে ইহা লইয়া কালীচরণ কিছুক্ষণ নিজের মনের মধ্যে

গবেষণা শুরু করিয়া দিল। তারপর খানিকটা বিশ্লেষণ এবং খানিকটা অনুমান করিয়া বলিল, রত্না! বলরামকে ডাকছো! বলরাম!

মুহূর্তে রত্নার মুখের উপর হইতে একটা অন্ধকারের ছায়া যেন সরিয়া গেল মনে হইল। ঘাড় বাঁকাইয়া রত্না যেন এই মুহূর্তেই বলরামকে দেখিতে চায়।

ব্যস্তভাবে কালীচরণ বলে, কি বলরামকে ডেকে দেব!

বলরাম সম্পর্কে রত্নার মনে কেন এই অকারণ চঞ্চলতা, কালীচরণ তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। কলাবতীকে ডাকিয়া বলে, শোনো তো বৌমা! রত্না তোমাকে কি যেন বলতে চাইছে!

কলাবতী রোগিণীর শিয়রে আসিয়া বসিলে কালীচরণ বারান্দায় গিয়া বসে; দেখে—হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া নিবারণ তখনও ঝিমাইতেছে। আর মাদুরের এক প্রান্তে কে যেন বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। অন্ধকারে কালীচরণ ভালো ঠাহর করিতে পারে না, বলে, কে নিরাপদ না?

উত্তর আসে, আজ্ঞে না, আমি বলরাম।

—ও বলরাম! তা কতক্ষণ?

—এই তো সবে আসছি। তা আপনি এলেন কোন পথে? আমি আবার গেলাম বটতলার রাস্তা বরাবর।

—তুমিও যেমন!

হঠাৎ ঘরের ভিতর কলাবতীর আর্ত কণ্ঠ শোনা যায়, ওগো মেয়ে যেন আমার কেমনতরো করে গো!

কালীচরণ ত্রস্তে রত্নার শিয়রে গিয়া দাঁড়ায়; হাত তুলিয়া কলাবতীকে বলে, আহা, ব্যস্ত হয়ো না।

চিৎকার শুনিয়া নিবারণ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় কিন্তু পরক্ষণেই কি বুঝিয়া সে আবার বসিয়া পড়ে।

তন্দ্রার ঘোরে নিবারণের মুখ দিয়া লালা পড়িতেছিল। বাঁ হাতের চেটোয় ও মুখ মুছিয়া ফেলে। মুখের মধ্যে নিবারণ কেমন যেন একটা কটু তিক্ত স্বাদ অনুভব করে। সারা সংসারটাও ওর কাছে যেন আজ এমনই বিষাইয়া গিয়াছে। তাহার এত সাধের মেয়ে রত্না! মরিবার সময় নিবারণ কি একবার তাহার মুখও দেখিবে না।

একটা আচ্ছন্নকর তুহিন জড়তা আজ তাহার স্নায়ুগুলিকে যেন একেবারে শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। মৃত্যুকে নিবারণ বড় ভয় করে। রত্নার মরণ সে আজ দাঁড়াইয়া দেখিবে কেমন করিয়া!

প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে মড়া আগলাইয়া বসিয়া রহিল কলাবতী, আর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কালীচরণ নিবারণের আষাড়ে আমগাছটার উপর কোপ বসাইল—খট্।

মড়া কাঁধে উঠিলে নিবারণের সহোদর নিরাপদের বউ গঙ্গা হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলে বিস্রস্ত বসনা কলাবতী

উদ্‌ভ্রান্তের মতো উঠানে নিবারণের পায়ের কাছে গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। সকলে ধরাধরি করিয়া নিবারণের বৌকে বারান্দায় লইয়া গিয়া অনেক সান্ত্বনা দিল। কলাবতীর সান্ত্বনা নাই, কাটা পাঁঠার মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া সে তারস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল।

শোকবিহ্বল কলাবতীর সান্ত্বনার জন্য নিবারণের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হয় না। লাল গামছাখানা কোমরে পাক দিয়া বাঁধিয়া নিবারণ পাটকাঠির বোঝাটা আস্তে আস্তে মাথায় তুলিয়া নেয়; অস্ফুটে বলে, আমার কাঁদবারও ফুরসুত নেই। বত্তার মুখে আগুন দিতে হবে যে!

মধ্যরাত্রির অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্মশান-যাত্রীরা ধ্বনি তুলিল, বলো হরি হরিবোল।

এত রাত্রে বৈকুণ্ঠ লাহিড়ী হয়তো প্রাকৃতিক তাগিদে বাহির হইয়া থাকিবেন। হরিবোল ধ্বনি শুনিয়া শ্মশান-যাত্রীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, বলি ও মারা গেল কে!

উত্তর আসিল, নিবারণ মণ্ডলের মেয়ে।

ইহলোকে মানব জীবনের নশ্বরতা সম্পর্কিত দার্শনিক তত্ত্বের একটি ফ্যাকড়া কয়েক মুহূর্তের জন্য বৈকুণ্ঠ লাহিড়ীকে ভাবাইয়া তুলিল। মাতৃহারা শিশুর মতো বৈকুণ্ঠ লাহিড়ী অন্ধকারে ডুকরিয়া উঠিলেন, মা মাগো! লাহিড়ীর খড়মের শব্দ অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

গ্রামের সীমান্তে বাওড়ের মুখে শ্মশান-যাত্রীরা সকলেই কাঁধ বদলাবদলি করিল; ছাড়িল না শুধু বলরাম।
কালীচরণ বলিল, বাড়তি লোক যখন রয়েছে তখন খামখা কষ্ট করবে কেন বলরাম! দাও, অভয় কাঁধ দিক।
বলরাম কিন্তু তবু ছাড়িল না। বাঁশের হাতলটা প্রাণপণে দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল। মাঝে-মাঝে হাত ঘুরাইয়া বলরাম মৃতের ঠাণ্ডা গালের উপর নিজের কড়াপড়া আঙুলগুলি বুলাইতে বুলাইতে ভাবিতেছিল: রত্না কি কিছুই টের পাইতেছে না! অভিমানে বলরামের কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। হরিবোল ধ্বনির ধূয়াতে এবার সে আর সাড়া দিতে পারে না।

নয়

সেদিন রাত্রে মালিনীর আর ঘুম হইল না। কালীচরণ আসিবে আসিবে করিয়া একেতো খাওয়া-দাওয়াই শেষ হইল অনেক রাত্রে, তারপর যত রাজ্যের আজে-বাজে চিন্তা ও দুর্ভাবনায় বাকি রাতটুকুও তাহার এপাশ-ওপাশ করিয়া কাটিল। কপট বৈরাগ্যের ভাব আনিয়া মালিনী দুই-একবার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া স্বগতোক্তি করিয়া বলিয়াছিল, সকল বন্ধন ঘুচাইয়া গোবিন্দ আবার তাহাকে কোন মায়াপাশে বাঁধিলেন। কিন্তু বন্ধনে যে এত আনন্দ হইতে পারে তাহা উপলব্ধি করিয়া মালিনী আবার সেই পরম কারুণিক গোবিন্দের উদ্দেশ্যেই প্রসন্নচিত্তে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম জানায়—অস্ফুটে বলে, তোমার লীলা বোঝা ভার!

চর্বিত পানের অবশিষ্টাংশ জিভ দিয়া মুখের এক কোণে ঠেলিয়া দিয়া মালিনী আবার নড়িয়া-চড়িয়া যুত করিয়া শুইল—স্পন্দিত হইতে লাগিল শুধু তাহার বামপায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি। সচেতন অবস্থায় মালিনীর পায়ের এই আঙ্গুলটি চিরকাল এমনই নড়ে। স্পন্দমান অঙ্গুলি-সঙ্কেতে মনে হয়, মালিনীর

নিতান্ত নারীজনোচিত কাঠামোর মধ্যে কোথায় যেন একটা পুরুষের কাঠিন্য লুকাইয়া আছে।

মালিনীর নিস্পলক চোখ তন্দ্রাহত হইয়া মাঝে মাঝে চিন্তাবিরতি আনে—আবার ভাবনা ; ঘুম তো চোখে নাই !

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিশেষে ম্লান চাঁদের স্তিমিত জ্যোৎস্না সর্বাঙ্গে মাখিয়া হাস্নুহানার মঞ্জুরিত বৃন্তগুলি ক্ষণে-ক্ষণে শিহরিয়া ওঠে। হাস্নুহানার গন্ধে আকুল হইয়া বিষধর নাকি হাস্নুহানার ডালে জড়াইয়া থাকে! মালিনী ভাবে : এ-কথা কি সত্য! মালিনীর গা শির-শির করে! আঁচলখানা মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া ভালো করিয়া গায়ে দেয় মালিনী।

ঠাকুরঝি-পুকুরের মধ্যে ঝপাং করিয়া কি যেন একটা শব্দ হয়। কিসের শব্দ ? তাল পড়িল না মাছ লাফাইল ! এত বড় মাছ ঠাকুরঝি-পুকুরে আছে নাকি! থাকিবে বা—প্রাচীন পুষ্করিণী ...আচ্ছা সেদিন যে কালীচরণ বলিতেছিল, রাঘব বোয়াল মাছ বাছুরের মতো ডাকে ! কথাটা কি সত্যি ! কি আশ্চর্য ! এমনও হয়! অন্ধকার ঘরে মালিনী একা-একাই নিঃশব্দে হাসে। সর্বাঙ্গের কোমল মাংসগুলি তাহার শুধু থর-থর করিয়া কাঁপে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে ! কতক্ষণই বা ইহার আয়ু ! এই তো গেল বলিয়া !

বাতাস লাগিয়া জানালাটা বারে বারে বন্ধ হইয়া যাইতেছে। হাত বাড়াইয়া মালিনী জানালার কপাট সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া

ছিটকিনি লাগাইয়া দেয়। অবাধ্য চুলগুলিকে ঘোমটার আড়ালে কানের পাশে পাট করিয়া দিয়া মাথার বালিশটা উল্‌টাইয়া শোয়।

এমন রাতে ঘুমাইতে সাধ যায় কাহার? কত তারাভরা আকাশ তো সে দেখিয়াছে কিন্তু আজ যেন আকাশের কোথাও এতটুকু ঠাঁই নাই। যে তারারা কোনোদিন ওঠে না তারাও যেন আজ ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘন নীল নীলাম্বরীর জমিনের উপর সহস্র সোনালি জরির চুমকি দেওয়া শাড়ির মতো সমগ্র আকাশখানা ঝলমল করিতেছে। রসা কাঁটাল গাছটার মসৃণ পাতার উপর দিয়া চাঁদের মায়া যেন পিছলাইয়া পড়িতেছে। কোথাও এতটুকু অশান্তি নাই, নাই এতটুকু উদ্বেগ। আবছা অন্ধকারের অবগুণ্ঠন টানিয়া মূক পৃথিবী না জানি কতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মিষ্টি মধুর হাসির মতো এক ঝলক জ্যোৎস্না হাসিতে হাসিতে যেন নেবুতলায় গলিয়া পড়ে। 'আ মরণ দূর হ' বলিয়া বুনো লতার ঝোপটাও যেন সহচরীর মতো একটা প্রীতির মুখ-ঝামটা দিয়া শিহরিয়া ওঠে। শুকনো বাঁশ পাতার উপর সমতালে পা ফেলিয়া খচ্‌মচ্‌ করিতে করিতে নিশাচর বাঁশঝাড় পার হইয়া যায়—বোধহয় শিয়াল। অদূর ভবিষ্যতে বৃষ্টির সম্ভাবনা জানাইয়া কট্‌কটে-ব্যাঙটা আশে পাশেই যেন কোথাও কট্‌কট্‌ করিয়া ডাকে। ঘরের মধ্যে একটা টিকটিকি টিকটিক করিয়া ওঠে।

মালিনী অস্ফুটে বলে, সত্যি-সত্যি-সত্যি।

পাশের ঘরে শুইয়া আছে গোবর্ধন আর দুর্গা। এখন হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একটু আগেও ওরা যেন কি বলাবলি করিতেছিল। এমন ওরা রোজই করে। মালিনী ভাবিয়া কুল পায় না, একজনের কাছে আর একজনের কি এত কথা থাকিতে পারে!

পাশ ফিরিয়া শোয় মালিনী। চণ্ডীমণ্ডপ ঘরের দরজায় শব্দ হইল না! বোধহয় কালীচরণ ফিরিল। মালিনী আবার উঠিয়া বসে। জানালা দিয়া কোনাকুনি তাকাইয়া দেখে, চণ্ডীমণ্ডপ ঘরের দরজা বন্ধ; যেমন তালা তেমনই লাগানো আছে। চাপা অভিযোগের অস্বস্তিকর অনুভূতি মালিনীর নাকের ডগায় লাল হইয়া ফুলিয়া ওঠে। আত্মমর্যাদাকে যথোচিত ভেট দিয়া নিজেকে নিজেই শাসন করিয়া বলে, কেন, এততেও লজ্জা নেই! আরক্ত অনুযোগের বাকি আক্ষেপটুকু ব্যক্ত হয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্রুত সঞ্চালনে, মুখের ভ্রূকুটিতে আর সুতীক্ষ্ণ দন্তপংক্তির মধ্যবর্তী সুকোমল বিম্বোষ্ঠের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে। মাথার বালিশটাকে তাচ্ছিল্যের সহিত উল্‌টাইয়া আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া মালিনী সেই যে এককাত হইয়া শুইয়া পড়ে আর ওঠে অনেক বেলায়।

কালীচরণ তখন ডাবা হুঁকায় তামাক টানিয়া চণ্ডীমণ্ডপ ঘরখানাকে প্রায় ধূমায়িত করিয়া তুলিয়াছে।

দশ

দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর চোখ একবার বোজা চাই চপলাসুন্দরীর। এ একেবারে অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অবিশ্যি রোজই যে ঘুমান, এমন নয়। কোনো-কোনো দিন হয়তো শুধু জল আর গড়াগড়িই খান। তবে অম্বল তো আর রোজ হয় না, সুতরাং মাসের মধ্যে বিশ দিন নিদ্রাটি একরকম সাধাই হইয়া গিয়াছে।

বড় বড় গোটা দুইটা পানের উপর সুপারি, চুন, খয়ের ও জর্দার অনুপানটা একটু বেশি মাত্রায় চড়াইয়া আঙ্গুলের মাথায় বেশ খানিকটা চুন লইয়া চপলাসুন্দরী খাটের উপর গিয়া ওঠেন। ইঁদুর মারিয়া বিড়াল যেমন থাবায় খেলে, খাটের উপর বসিয়া চপলাসুন্দরী ঠিক তেমনি পানের উপরকার চিকি সুপারিগুলি এক আঙ্গুলে নাড়িতে থাকেন। তারপর কোনো একটি বাঞ্ছিত মুহূর্তে দুই হাতের আঙ্গুলে সমগ্র পান দুইটাকে মশলা সমেত ডলিয়া-পিষিয়া মুখ গহ্বরে চালান করিয়া দেন। কোনো-কোনো দিন সজ্ঞানেই খান, আবার কোনো দিন এমন হয় যে, খাইলেন কখন টেরও পান না। বাঁ গাল ফুলাইয়া দেউড়ির দিকের কাঁটাল

গাছটার দিকে তাকাইয়া দেখেন, এবার কয়টা কাঁটাল হইয়াছে। রোজ আবার কাঁটালও ঠিক দেখেন না। কাঁটালের দিকে তাকাইয়া দেখেন লিচু—শতনামপুর হইতে দেড়শো মাইল উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত কোনো একটি গ্রামের একটি গাছে থোপা-থোপা লিচু ধরিয়া আছে। সুপক্ক লিচুর বর্ণ যেন অজ্ঞাতে চপলাসুন্দরীর দুই ঠোঁটে ভর করিয়া নামে। হাসিয়া বলেন, সুনন্দা তোর মামার বাড়ির সেই লিচুর কথা মনে পড়ে না! সত্যি অমন লিচু আর দেখলুম না কোথাও। চপলাসুন্দরীর কথায় সুনন্দা হয়তো তেমন একটা উৎসাহ প্রকাশ করে না। দুই কাঁটায় সোয়েটারের নূতন একটা ঘর তুলিবার ফাঁকে সংক্ষিপ্ত একটা হুঁ দিয়াই চুপ করিয়া যায়। বাপের বাড়ির সম্পর্কে চপলাসুন্দরী যাচিয়া আর কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেন না। কি জানি, বেশ বলিতে গেলে সুনন্দা যদি আবার ঠেস্ মারিয়া বলিয়া ওঠে—নাও, তোমার বাপের বাড়ির কুটো-গাছটাও ভালো। মেয়ে যা মুখফোঁড়!

রোজ যেমন আজও ঠিক তেমনি। মোটা একটা তাকিয়ার উপর মাথার ভিজা চুলগুলি ছড়াইয়া দিয়া চপলাসুন্দরী পান মুখে করিয়া শুইয়াছেন। সুনন্দার ঘুমের বালাই নাই, পাশ ফিরিয়া শুইয়া বই পড়িতেছে। মুশকিল হইয়াছে চপলাসুন্দরীর—এমন একটা লোক নাই যে ইচ্ছামতো খানিকটা কথা বলিয়া যান। শুইলেই তো আর ঘুম আসে না।

বিরক্ত বোধ করেন চপলাসুন্দরী। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলেন, আচ্ছা সুনি, কি ছাইপাঁশ পড়িস আজকাল রাতদিন বল তো! বই রেখে আমার দিকে মুখ করে শো!

কথা এক কান দিয়া ঢুকিয়া আর এক কান দিয়া বাহির হইয়া যায় সুনন্দার। ঘুরিয়া শোওয়া তো দূরের কথা, নড়িয়াও সায় দেয় না সুনন্দা।

কয়েক মুহূর্ত কাটিয়া যায়। চপলাসুন্দরী পাশ বালিশটা আঁকড়াইয়া অন্য দিকে পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে বলেন, পুরুষমানুষের মতো মেয়েমানুষের আবার পড়া কি লা এত!... হচ্ছে, সব আজকাল!

মুখের পানটা ফুরাইতে আর কি যতক্ষণ লাগে, তারপরই চপলা-সুন্দরীর আর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। একটু পরেই উঠিয়া পড়ে সুনন্দা। আর্শির সামনে দাঁড়াইয়া ভিজা গামছা দিয়া তাড়াতাড়ি মুখের তেলটা ঘসিয়া তোলে; তারপর মাথায় দুইটা চিরুনির আঁচড় টানিয়া বই হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

সুনন্দা ভাবিয়াছিল অতর্কিতে পিছন দিক হইতে একটা শব্দ করিয়া মালিনীকে চমকাইয়া দিবে। কিন্তু মালিনীকে সম্পূর্ণ ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিয়া সুনন্দা একেবারে সরাসরি গিয়া ওঠে চণ্ডীমণ্ডপে। প্রথমেই অবশ্য ঘরে ঢোকে না। ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গাইবার পূর্বে খানিকটা স্বেচ্ছায়ই একটা হোঁচট খাইয়া নেয়

পায়ে। তারপর ডান পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়া একটু নেংচাইয়া ঘরে ঢুকে।

কালীচরণ জাগিয়াই শুইয়া ছিল। শব্দ শুনিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে। বলে, কি, লাগলো নাকি সুনন্দা!

ব্যাথাটাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া এখন হাসিমুখে—না লাগেনি—বলিতে চমৎকার লাগে সুনন্দার।

কই না তো।

কালীচরণ বলে, লেগেছে বলছি আর তুমি স্রেফ চেপে যাচ্ছো। এবার আরও ভালো লাগে। সুনন্দা হাসিয়া বলে, ও কিছু না, এমনিই···বেরোওনি তুমি আজ বুঝি কালীদা!

কালীচরণ উদাসীনভাবে বলে, না শরীরটা ভালো নেই বলে আজ আর বেরুলাম না।···তারপর ওখানা কি বই! ও, সেই যে দিয়েছিলাম ইতিহাসখানা, না? তা এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল! সুনন্দা বাঁ-কাঁধের উপর মাথাটাকে নোয়াইয়া দিয়া বলে, স-ব পড়ে ফেলেছি।

বিশ্বাস হয় না কালীচরণের। বলে, সাড়ে তিন শো পাতার বই তুমি দুদিনের মধ্যে শেষ করে ফেললে! বিশ্বাস হয় না।

সুনন্দা এবারে একটু ঘাবড়াইয়া যায়। বলে, পড়া মানে কি আর আমি তেমনি খুঁটিয়ে পড়েছি তোমার মতো, এমনি ওপর ওপর দেখে গিইছি।

মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টানিয়া কালীচরণ বলে, ও, ওপর-ওপর

দেখে গিয়েছ—তা বেশ। এই না হলে আর পড়া।···সব বইগুলোই বোধহয় এই রকমই পড়ো !

সুনন্দা বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করিয়া কালীচরণের দিকে তাকাইয়া বলে, না তোমার সেই গল্পের বইগুলো···

সুনন্দার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কালীচরণ বলে, খুঁটিয়ে পড়ো, কেমন ?

সুনন্দা নিশ্চিন্ত হইয়া বলে, হ্যাঁ।

—ঠিক ?

—বেশ লাগে।

এবার কালীচরণ হাসিয়া ফেলে। বলে, হায়রে অদৃষ্ট, বইখানা দেবার আগে অত বড় একটা লেকচার দিলাম তোমাকে, তা স্রেফ ওপর-ওপর দেখেই ছেড়ে দিলে !

সুনন্দা অপরাধীর মতো বলে, সবটা খুঁটিয়ে পড়া উচিত ছিল, না ?

কালীচরণ মাথা চুলকাইয়া বলে, না তা আর বলি কি করে !

—আচ্ছা বইটা আমি আবার নিয়ে যাচ্ছি, ভালো করে খুঁটিয়ে পড়ে দেবো এবার।

—মাপ করো, পরের বই, আমায় আজই ফেরত দিতে হবে।

সুনন্দা শুনিবার পাত্র নহে। বলে, আচ্ছা আর দুটো দিন না হয় থাকলোই ; খেয়ে তো আর ফেলছিনে বই !

সুনন্দা পলাইয়া রক্ষা পাইতে চায়।

গলার স্বরটা এবার একটু কঠিন করিয়াই কালীচরণ বলিয়া ওঠে, রেখে দিয়ে যেও বইখানা, সুনন্দা। আমাকে আজই ফেরত দিতে হবে ওটা।
এই ঋজু কণ্ঠস্বরটাকে শুধু সুনন্দা কেন, অনেকেই জানে। গোটা মানুষটার অন্তরঙ্গ রূপটা যেন এই বিশিষ্ট স্বরবিন্যাসের মধ্যে ধরিতে পারা যায়।
সুনন্দা ফিরিয়া আসে। আস্তে আস্তে বইখানা বেঞ্চির উপর রাখিয়া দিয়া বলে, তুমি রাগ করেছো কালীদা আমার ওপর! …কালীদা!
কালীচরণ প্রথমটা কোনো উত্তর করে না। তারপর সহজভাবেই বলে, উত্তরটা কি ধরনের হলে তুমি খুশি হও!
সুনন্দা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না কালীচরণের কথা। বলে, রাগ করো না কালীদা আমার ওপর। সত্যি…
সুনন্দা নাছোড়বন্দা।
মুখ গুঁজিয়া শুইয়াছিল কালীচরণ। উঠিয়া বসিল। সুনন্দার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, কি চাও তুমি বলতে—বলো। তুমি জিগগেস করছো যে রাগ করেছি কি না আমি তোমার ওপর। তারপর সে কথার উত্তরে তুমি হয়তো আবার বলতে চাও যে, আমি যেন কিছুতেই রাগ না করি তোমার উপর। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে, এই ধরনের কতকগুলো বাজে কথা কি না আওড়ালেই নয়…বই নিয়ে গিছলে, ভালো

লাগেনি, ফেরত দিয়ে যাবে—ব্যাস ফুরিয়ে গেল। এর ভেতর···

কালীচরণ কথা শেষ না করিতেই উঠিয়া দাঁড়ায় সুনন্দা। ঠোঁট কামড়াইয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলে, থাক, তোমার আর লেকচার দিয়ে বোঝাতে হবে না আমায়। আমি যাচ্ছি।

দমকা বাতাসের ঝাপটার মতো সুনন্দা চোখে আঁচল চাপিয়া চণ্ডীমণ্ডপ ঘরের বাহির হইয়া যায়।

পিছন হইতে কালীচরণ বলে, ওটা খুব সহজ—very easy.

শোরগোলে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া আসিয়া দাঁড়ায় মালিনী। বলে, কি হয়েছে!

কালীচরণ সংক্ষিপ্ত উত্তর করে, কিছু না।

ঘুম ছুটিয়া গেলেও বিবশতা তখনও আচ্ছন্ন করিয়া আছে মালিনীর স্নায়ুটাকে। সুনন্দা আসিয়াছিল কি আসে নাই, কালীচরণের এই ধরনের অস্বস্তির আকস্মিক হেতুটাই বা কি, পুষি বিড়ালটা ঘুমাইতেছিল ও ঘরে, চণ্ডীমণ্ডপ ঘরেই বা আসিল কখন—বিক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি সমগ্রভাবে তখনও মালিনীর মাথায় ঠিক দানা বাঁধিতে পারে না।

এগারো

সকাল বেলাকার বাসি কাজ সারিয়া একটা ডুব দিয়া আসিবার জন্য ঘড়া কাঁকালে মালিনী চলিল ঠাকুরঝি-পুকুরে। পথের দুই ধারে সারি-সারি সুপারি গাছ—কাঁদি-কাঁদি সুপারি পাকিয়া লাল টুকটুকে হইয়া আছে। বাদুড় যে কত সুপারি খাইয়া গাছতলায় ফেলিয়াছে! মালিনী পিতলের ভারী ঘড়াটা বনের ধারে নামাইয়া রাখিয়া সুপারি কুড়াইতে লাগিয়া যায়।

তা মন্দই বা হইল কি! মাত্র এই কয়টা গাছতলা ঘুরিয়াই কোঁচড় ভরতি হইয়া গেল। আধ পণটাক তো হইবেই; আধগণ্ডা করিয়া পয়সায় হইলে পাঁচ আনার কম নয়। মালিনী ভাবে, নাঃ, আজই এ-বিষয়ে কালীচরণকে বলিয়া জন ধরিয়া গাছগুলি সব ভালো করিয়া ঝুরাইয়া ফেলিতে হইবে।

উনুনের পোড়া লাল মাটি দিয়া দাঁত মাজিতে-মাজিতে মালিনী নারিকেল গাছগুলির দিকে ঊর্ধ্বমুখে তাকাইয়া থাকে। কলিকাতা যদি একান্ত যাইতেই হয় তাহা হইলে অন্তত ঝুনা নারিকেলগুলি তো সব পাড়াইয়া ফেলিতে হয়। নচেত ফিরিয়া আসিয়া একটা নারিকেলের মুখও তো দেখিতে পাওয়া যাইবে

না। কালীচরণের উপর ভরসা করিয়া গেলেই হইয়াছে আর কি! সাতভূতে না লুটিয়া খাইবে! কালীচরণের যদি এদিকে মন ঠিকই থাকিবে তবে আজ তাহার দুঃখ কিসের। মালিনীর অজ্ঞাতে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িয়া ঘেঁটুফুলের শ্বেত স্তবকটি কাঁপিয়া ওঠে—উগ্র প্রশ্বাসে কালো পিপীলিকাটা পরাগের উপর হইতে যেন ছটফট করিতে করিতেই মাটিতে পড়িয়া যায়। মালিনী ভাবে, সব ঝুনো নারিকেলগুলি পাড়িয়া কতকগুলি ভাঁড়ারে রাখিয়া যাইবে, আর বাকিগুলির দ্বারা উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া কলকাতা লইয়া যাইবে। গোবর্ধন নাড়ু খাইয়াই সে দিন ধন্য-ধন্য করিতেছিল; মালিনীর হাতের নারিকেল-ছাঁচ ও তক্তি তো খায়ই নাই।

কলিকাতা যাইবার কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় বাগানের মধ্যে একটা আসশ্যাওড়া গাছের পাতা কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িতে-ছিঁড়িতে মালিনী কেমন যেন আনমনা হইয়া ভাবে—আচ্ছা, গোবর্ধন তো দুর্গার বর; আর সে নিজে হলো গিয়ে দুর্গার সৎমা, ঐ মা-ই হলো—না! তাহলে গোবর্ধনের সম্পর্কে সে হলো গিয়ে শাশুড়ী! গোবর্ধনের মুখের আদলটা আসে কিন্তু বাঁশপোতার শ্রীশদার মতো। উঃ, শ্রীশদা লোকটা কি ভয়ানক পাজি! মিছামিছি কাঁচামিঠা আম পাড়িয়া দিবার নাম করিয়া ভুলাইয়া লইয়া গিয়া বিশ্বাসদের তেঁতুলতলায় শ্রীশদা না তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল একদিন! নিজের কাছে নিজেই ধরা

পড়িয়া গিয়া মালিনী অপ্রতিভ হইয়া যায় এবং যেন অপর কাহারো ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তিকে এড়াইবার জন্যই কলসীটা ছোঁ মারিয়া কাঁখে তুলিয়া লইয়া মুহূর্তে ঠাকুরঝি-পুকুরের উদ্দেশে উধাও হইয়া যায়।

মালিনীর লজ্জা পাইয়াছে নাকি!

ঘাটে দেখা পীতাম্বর ওঝার বিধবা বউ পদ্মাবতীর সঙ্গে—পশ্চিম পাড়ার ডাকসাইটে দজ্জাল মেয়েমানুষ। পাড়ার লোকে বলে, দিনে যোগিনী রাতে বাঘিনী। সম্প্রতি পদ্মাবতী আবার দীক্ষা লইয়া কণ্ঠিধারণ করিয়াছে। থাকে-থাকে, আড় চোখে কটাক্ষ হানিয়া মুচকি-মুচকি হাসে আর বলে, গোবিন্দ ভরসা।

সুখ্যাতি ও কুখ্যাতি মিশাইয়া পদ্মাবতী স্বনামধন্যা, তবে বিভিন্ন নামে সুপরিচিতা। যেমন গাঁয়ের লোকে ডাকে গঙ্গার মা বলিয়া, আবার উত্তরপাড়া ও পিরপুর অঞ্চলের লোকেরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে যোগিনী বলিয়া ডাকে—উজানচরের নমঃশূদ্র শ্রেণী কিন্তু ডাকে মা বলিয়া। পদ্মাবতী মৃতবৎসার ওষুধ জানে, উচাটন ও বশীকরণের মন্ত্রতন্ত্র জানে—ভালোকে মন্দ ও মন্দকে ভালো করিতে পারে।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ লক্ষ্মীপুরের শাক্ত জমিদার চন্দ্রনাথ এতদিন পদ্মা বলিয়াই ডাকিতেন, কিন্তু পদ্মাবতীর অনুশাসনে এখন তাঁহাকেও সসম্মানে পদ্মরানী বলিয়া ডাকিতে হয়। সকলের

অজ্ঞাতে চন্দ্রনাথ তাঁহার কারণরসে স্তিমিত ঈষৎ রক্তাভ চক্ষুদ্বয় কোনোমতে তুলিয়া এখনও হয়তো সোহাগের সুরে ডাকেন পদ্মা—কিন্তু একথা না জানে প্রজারা, না জানেন চন্দ্রনাথের পত্নী সুভদ্রা।

বৃদ্ধ চন্দ্রনাথ পদ্মাবতীকে বলিতেন, ছাখো, তোমার আর সব আমি ভালোবাসি শুধু তোমার কণ্ঠিটা···

কৃত্রিম অভিমানের সুরে বুড়া চন্দ্রনাথকে একটা ঠেলা দিয়া পদ্মাবতী বলিয়া উঠিত, যাও যাও, তুমি হলে শাক্ত আর আমি হলাম গিয়ে বৈষ্ণব; কণ্ঠি আমাদের ধারণ করতেই হয়—গুরুর আদেশ যে।

চন্দ্রনাথ গদগদ হইয়া বলে, তা সেই তোমার মটরমালাছড়া পরলেই পার চাঁদ! সেও তো তোমার একরকম কণ্ঠি!

মিশি লাগানো কালো দাগী দাঁতগুলি বাহির করিয়া পদ্মাবতী স্মিতহাস্যে বলিত, তা সে তোমার মটরমালা পরলেও কণ্ঠি ছাড়বার উপায় নেই গো।···আচ্ছা বলছো যখন তখন আসছে দোলপূর্ণিমার দিন বার করে পরবো এখন। তারপর চন্দ্রনাথের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ পদ্মাবতী চন্দ্রনাথের থুতনি ধরিয়া গদগদকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া উঠিত, গোরাচাঁদের বরণ কেমন!

পাদপূরণের অবসর না দিয়া চন্দ্রনাথ কৃত্রিম বিরক্তিভরে মুখ সরাইয়া লইয়া বলিতেন, যাঃ, ভালো লাগে না মাইরি

পদ্মা! তার চাইতে ভালো করে একটা পান সাজ তো দেখি!

স্মিতহাস্যে কটাক্ষ হানিয়া পদ্মাবতী চন্দ্রনাথকে বলিত, শুধু একটা পান! তাতে আর কি হয়েছে!

চন্দ্রনাথের বয়স হইয়াছে। রসিকতা তিনি এখনও বেশ বোঝেন, কিন্তু প্রবৃত্তিগুলি এখন যেন তেমন আর সাড়া দেয় না। প্রায় পাংশু স্থূল বিকৃত ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টানিয়া চন্দ্রনাথ তবু পদ্মাবতীকে ধরিবার জন্য এখনও মাঝে মাঝে হাত বাড়াইয়া দেন। কিন্তু সেটা নেহাত অভ্যাস দোষ, নিতান্তই আবেগহীন। চন্দ্রনাথের প্রসারিত হস্ত ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া পদ্মাবতী এখন বলিয়া ওঠে, 'আ গেল যা, বুড়োর ঢং দেখে মরতে ইচ্ছে যায়, দূর হ...।'

বেচারী চন্দ্রনাথ! আখড়ার প্রায়ান্ধকার একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া চন্দ্রনাথ এখন শুধু পান চিবান আর ঝিমান। অন্ধকারে শাদা জরির সটকাটা শিতল পাটির উপর সাপের মতো চিকচিক করিতে থাকে।

রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরে আরতি ও ভোগরাগ শেষ হইতে অনেক রাত হইয়া যায়। চন্দ্রনাথ দূর হইতে প্রত্যহ একটা রূপার টাকা তাম্রকুণ্ডের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া করজোড়ে মনে মনে আওড়ান, মত ও পথ বিভিন্ন হইলেও গন্তব্যস্থল ঐ একই। ক্ষণিক পরিতৃপ্তিতে চন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইয়া ওঠে।

তারপর চন্দ্রনাথের অঙ্গুলি সঙ্কেতে চার বেহারার পালকি যথারীতি চন্দ্রনাথকে গড়ের সন্নিকটে পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় নেয়। চন্দ্রনাথ খেয়ানৌকা করিয়া গড় অতিক্রম করিয়া কাটা দরজার সুড়ঙ্গ পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন মধ্যরাত্রে। কোথাও কোনোরূপ সন্দেহমূলক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য দৃষ্টিগোচর হইলে বড় জোর একবার একটা গলা খাঁকরি দেন চন্দ্রনাথ। ব্যস্, সমস্ত অভিযোগ ও মন্ত্রণা নৈশ অন্ধকারের গর্ভে চিরতরে অবলুপ্ত হইয়া যায়। এরূপ অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিজাত চন্দ্রনাথ যে কেমন করিয়া সামান্য একজন নীচজাতীয়া বোষ্টমীর অঙ্গুলি সঙ্কেতে চালিত হন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। উপরে বসিয়া শাসন করার প্রবৃত্তি যাহাদের মজ্জাগত এটায় বোধহয় তাহাদের অদ্ভুত ধরনের একটা বিলাস।

বারো

স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জলের মধ্যে পদ্মাবতীর মুখ বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র হইতে বৃহদাকৃতিতে রূপান্তরিত হইয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে জলের উপর ভাসিয়া ওঠে। হ্যাঁ, বয়স হইলেও পদ্মাবতীর রূপ আছে বটে। ভিজা চুলগুলি চোখমুখের উপর হইতে দুই হাতে মাথায় পাট করিয়া স্মিত হাস্যে পদ্মাবতী মালিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলে, মেয়ে না কি গো! আজ যে এত দেরি! ভাবলাম বলি, আজ আমি বুঝি একাই পড়ে গেলাম। ঠাকুরঝি-পুকুরের জলে পদ্মাবতীর মখ আবার টুপ করিয়া তলাইয়া যায়।

পুকুর পাড়ে সুবৃহৎ নারিকেল গাছগুলি ঠাকুরঝি-পুকুরের জলের মধ্যে থাকিয়া-থাকিয়া অসংখ্য ময়াল সাপের মতো কিলবিল করিয়া ওঠে। মাঝপুকুরে একটা বিচিত্রবর্ণ মাছরাঙ্গা প্যাখ্রি চেলা মাছ ধরিবার আশায় বাঁশের পালার উপর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঠায় বসিয়া আছে। পুকুরের উত্তর পাড়ে ঝোপঝাপের আবছায়ে কলমি দামের উপর একটা বক একটি পা ফেলিয়া আর একটি পা ফেলিবে কি না যেন তাহাই

বিচক্ষণের মতো ভাবে। অপরিণামদর্শী মালিনী দেখিয়া শিক্ষা লাভ করুক! আঘাটায় কচুগাছ ও মানুষপ্রমাণ শ্যামাঘাসের মাঝখানে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গুটাইয়া নন্দ নাপিতের ভাইপো সুরেন ওরফে সুরো নাপতি ঘন পানার ফাঁকে পিঁপড়ের টোপের সাহায্যে সন্তর্পণে ছিপ ফেলে। সুরো মাছও ধরে, মেয়েমানুষও দেখে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, ভোরের ঝুলে কই মাছ খায় ভালো।

দূর হইতে অগভীর স্বচ্ছ জলের মধ্যে পদ্মাবতীর সুগঠিত দেহ অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। ফাতনা তলাইয়া মাছ যে কখন টোপ খাইয়া পালাইয়া যায় সুরো তাহা টেরও পায় না। নিস্তরঙ্গ জলের উপর অসংখ্য তরঙ্গভঙ্গের সৃষ্টি করিয়া পদ্মাবতীর মুখ আবার কাঁপিতে-কাঁপিতে ভাসিয়া ওঠে।

লাল গামছা দিয়া গা রগড়াইতে-রগড়াইতে পদ্মাবতী হাসিয়া বলে, দেখলাম জামাই। কি মিষ্টি কথা আর কি সোন্দর ব্যাভার! বেশ জামাই হয়েছে!

মালিনী বলে, তা তোমাদের জামাই, মাসি, ভালো হলেই ভালো। আমার আর কি বলো; এই যে বললে—শুনেই তৃপ্তি।

মুচকি হাসিয়া পদ্মাবতী বলে, তা হলফ করে বললি ঝুটে দিদি কিন্তু মানালো না। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, ও কথা বরং বলতে পারি আমরা। তোর মুখে কি ও কথা শোভা পায়! তবে কেন, না অদেষ্টেতে বলাচ্ছে। কথায় বলে

না, কপালে নেইক ঘি, ঠকঠকালে হবে কি—তা সেই বৃত্তান্ত —গোবিন্দ, গোবিন্দ।···

শান বাঁধানো সিঁড়ির উপর বসিয়া মালিনী আনমনে হাত দিয়া জল কাটিতেছিল। অনবধান হেতু পদ্মাবতীর কথার প্রকৃত তাৎপর্যটা সে ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাই গোবিন্দের নাম স্মরণ করিয়া পদ্মাবতী যতক্ষণ বদ্ধ কৃতাঞ্জলি হইয়া মুদ্রিত নেত্রে ইষ্ট দেবতার আরাধনায় সমাহিত ছিল মালিনী ততক্ষণ বিশ্লেষণের ভঙ্গীতে পদ্মাবতীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিল। চোখে চোখ পড়তেই কৃত্রিম অভিমান মিশ্রিত ক্ষোভের সুরে মালিনী একটু মুচকি হাসিয়া বলিয়া ওঠে, যাও মাসি, তোমার কথাই যেন কেমনতরো···হ্যাঁ। তাও আবার হয় নাকি।

হাত ঘুরাইয়া-ঘুরাইয়া ভারী পিতলের ঘড়াটায় তেঁতুলের প্রলেপ দিবার সময় ঠিক বুকের অন্তস্থল হইতে একটি শিহরণ উঠিয়া নিমেষে মালিনীর সর্বাঙ্গে একটা দোলা দিয়া যায়। এই বসিয়া আছে—হঠাৎ এমন হয় মালিনীর অনেক সময়।

বড় চোখ দুইটাকে ছোট করিয়া অভিজ্ঞের ভঙ্গীতে পদ্মাবতী মালিনীর দিকে তাকাইয়া বলে, ও, মনে ধরল না বুঝি! কি জানি বাপু! তবে নিজের ধরনে যা বুঝি—এই মাত্তর। বোষ্টম গেছে আজ দশ বছর···দশ বছর? হ্যাঁ, তা হলো বৈকি! তাঁরও যাওয়া আর আমারও দীক্ষা নেওয়া। গোবিন্দের চরণ

ধরে আজ পর্যন্তও তো পড়ে আছি। কিন্তু কই, কামনা-বাসনা কি একেবারে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি! গোরাচাঁদের আর দোষ দেব কি দিদি। তাই মাঝে-মাঝে মনটা কি রকম হু হু করে ওঠে; থাকি থাকি—যাই ছুটে মোহন্তের কাছে। তা তিনি আবার যা বলেন তা শুনেও তো স্থির থাকতে পারিনে।

মালিনী বলে, কি বলেন তিনি?

ঘাড় নাড়িয়া বিজ্ঞের স্বরে পদ্মাবতী বলে, হুঁঃ, মোহন্ত যা বলে তা আর কি বলব। অবিশ্যি কথা কিছুই না, কিন্তু বোঝে ক'জনা! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জোর দিয়া পদ্মাবতী বলে, মোহন্ত বলে, তাঁরই কামনা-বাসনা জীবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে—কার্য কারণের তিনিই একমাত্র আধার। আমিই বা কে আর তুমি বা কে! আমি তুমি তো ঘট—জড় পদার্থ। জড়ের কি কোনো কামনা-বাসনা থাকতে পারে? হাসালে তুমি রাধে …এর পর আর কি বলব বল দিদি! যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া পদ্মাবতী বলে, তা এখন ঐ গোবিন্দের চরণ-ভরসা করেই পড়ে আছি; তিনি যা করান। কর্তব্য অকর্তব্য এখন আমার আর কিছুই নেই। তবে মিথ্যে বলব কেন, খুঁত-খুঁতোনি এখনও আছে। হিসেব করার অভ্যাস আজও যায় নি। যাবে কিনা কোনো দিন তাও ঐ একমাত্তর গোবিন্দই জানেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে পদ্মাবতী অঞ্জলি ভরিয়া জল দিতে থাকে।

একটু পরে মালিনীর দিকে তাকাইয়া বিস্মিতের স্বরে বলে, রাধে গোবিন্দ, তোর আক্কেল কেমন দিদি! এখন পর্যন্ত মাথায় একটু জল দিতে পারলিনে। মাথা ধরে অসুখ করবে যে। নে নে ডুব দিয়ে ওঠ। বেলা কি কম হয়েছে···গোবিন্দ গোবিন্দ···

জল ছিটাইয়া ঘাটের সিঁড়িগুলি শুদ্ধ করিয়া লইয়া পদ্মাবতী জল হইতে উপরে উঠিতে যাইবে এমন সময় পিছন হইতে মালিনী ঈষৎ নিম্নস্বরে বলে, মাসি, তা আমি যে কথা বলেছিলাম তার কি করলে!

বিস্মিতের স্বরে পদ্মাবতী বলে, কোন কথা বল দিকি?

সলজ্জ মুচকি হাসিয়া মালিনী বলে, আহা, তুমি যেন কেমনতরো লোক মাসি, এর মধ্যে ভুলে গেলে!

স্মরণ করিবার ভান করিয়া হাত নাড়িয়া পদ্মাবতী বলে, তা বাছা ভুলো মন আমার, কখন কি বলেছিলে, তা কি ছাই মনে আছে!

অভিমান ভরে মালিনী বলে, ভুলো মন তো ভুলো মন, থাক আর বলে কাজ নেই।

দুই এক পা আগাইয়া আসিয়া সোহাগের স্বরে পদ্মাবতী বলে, সত্যিই বলছি ঠাট্টা করছি না দিদি। পোড়া মনে আজকাল যদি কিছু মনে থাকে।

ঘাড় বাঁকাইয়া চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া মালিনী বলে, সেই

যে একদিন···ঘাটে স্নান করতে-করতে বলেছিলাম! আচ্ছা কবে বলেছিলাম বলছি। ···হ্যাঁ, সেই তুমি যেদিন বললে ক-জন অতিথি বোষ্টম এসেছে···মনে পড়ছে?

এতক্ষণে ভ্রূ টানিয়া পদ্মাবতী স্মিতহাস্যে বলে, ও বুঝলাম। লজ্জিতভাবে একটু হাসিয়া মালিনী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নেয়।

পদ্মাবতী বলে, এই কথার এত ভনিতে···হুঁ! স্পষ্ট করে বললেই হত। আমি ভাবলাম, বলি কি কথা না কথা। রাধে গোবিন্দ! তা দিতে তো আমার কোনো আপত্তি নেই বাছা! দিন ক্ষণ দেখে একদিন নিলেই পার!

মালিনী সাগ্রহে কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ উপরে উঠিয়া আসিয়া বলে, ব্যাগ্‌গাতা করি, দোহাই তোমার মাসি, করে দেবে বল। আগামী মঙ্গলবার তিথিও ভালো আছে ঘোর অমাবস্যা—হয় না সেদিন! দাও না মাসি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

চোখের উপর শশব্যস্তে প্রতি নমস্কার জানাইয়া পদ্মাবতী বলে, ওমা সে কি কথা! সকাল বেলা বামুনের মেয়ে দিদি তুমি দেখছি আমায় পাপের দায়ে ঠেকালে। ছি ছি, অমন কথা মুখেও এনো না; না হয় বয়সে ছোট, তবু হাজার হোক বামুনের মেয়ে তো! রাধে গোবিন্দ, কি জ্বালা বলো তো!

চোখের উপর পিতলের ঘড়াটা ভাসিতে-ভাসিতে ডুব জলে চলিয়া যায়, মালিনী ফিরিয়াও তাকায় না। পদ্মাবতীর দিকে

বিষণ্ণ চোখ দুইটি তুলিয়া অনুনয়ের সুরে বলে, তোমার গোপালের আমি সোনার নাড়ু গড়িয়ে দেব মাসি, আমায় বিমুখ কোরো না।

পদ্মাবতী হাসিয়া বলৈ, সোনার নাড়ু তো গোপালকে দেবে। মাসিকে কি দেবে?

—তোমাকে! তোমায় আর কি দেব মাসি, তুমি আমার হাতের এই আংটিটা নিওখ'ন। জোর করিয়া পদ্মাবতীর বাম হস্তের অনামিকায় আংটিটি পরাইয়া উৎসাহভরে বলে, বাঃ, চমৎকার মানিয়েছে তো! আংটিটা আমি তোমায় পেন্নামি দিলাম মাসি; কিছু মনে কোরো না। না নিলে বুঝব, তুমি আমায় একটুও ভালোবাস না।

কৃত্রিম সার্বজনীন হাসি হাসিয়া পদ্মাবতী বলে, আচ্ছা, কি মন তোমার দিদি! তোমার ঠেঁয়ে প্রতিদান নিয়ে আমাকে তোমার উপকার করতে হবে নাকি! রাধে গোবিন্দ!

পদ্মাবতীকে অঙ্গুলি হইতে আংটিটা খুলিয়া ফেলিতে নিরস্ত করিয়া মালিনী হাসিয়া বলে, প্রতিদান তুমি তো নাওনি, আমিই তোমাকে খুশি হয়ে দিয়েছি। ভালোবাসার দান কি এমন করে ফিরিয়ে দিতে হয় মাসি! আমার মনে বুঝি কষ্ট হয় না!

নিরুপায় পদ্মাবতী শপথ করিয়া বলে, বাসি মুখে আমি তোমায় কথা দিচ্ছি দিদি, যে এই মঙ্গলবারের মধ্যেই তুমি

তোমার জিনিস পাবে। লক্ষ্মী দিদি কথা রাখ, তোমার আংটি তোমার থাক।

পদ্মাবতী আংটিটা খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেই মালিনী—ও আমি নেবই না—বলিয়া সাঁতার দিয়া গভীর জলে চলিয়া যায়। পিতলের ঘড়াটা পেটের তলায় চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে মালিনী বলে, গুরুদক্ষিণা দিলে যদি পাপ হয় তো সে পাপ আমার। কি যে তুমি বলো মাসি! শাস্ত্রের বচন অমান্য করে শেষকালে আমি রসাতলে যাই আর কি?

পদ্মাবতী হাসিয়া বলে, নাঃ—এ মেয়ের সঙ্গে পারবার উপায় নেই দেখছি।...আচ্ছা, এখন না নাও পরে নিওখ'ন। তাই বলে নতুন জলে আর মেতো না দিদি। ঠাণ্ডা লেগে অসুখ-বিসুখ করবে।

মালিনী আশ্বস্ত হইয়া স্মিতহাস্যে বলে, তুমি এগোও মাসি! ভিজে কাপড়ে আমার জন্যে আর দাঁড়িয়ে থেকো না। আমিও এই উঠলাম বলে।...সময় পাই তো বিকেল বেলা তোমার আখড়ায় একবার বেড়াতে যাবখ'ন।

অভিমানের সুরে পদ্মাবতী টানিয়া টানিয়া বলে, হ্যাঁ, নিত্যিই যাচ্ছ!...সে সৌভাগ্যি কি আর আমি করিছি!

পদ্মাবতী হেলিতে দুলিতে চলিয়া যায়। গেরুয়া রঙের ভিজে কাপড়টা বারবার তাহার দুই পায়ে জড়াইয়া গিয়া শিথিল গতি শিথিলতর করিয়া তোলে।

।পছন হইতে মালিনী চেঁচাইয়া বলে, বাড়ি থেকো কিন্তু মাসি আজ বিকেল বেলা।

দূর হইতে পদ্মাবতী শুধু একবার মালিনীর দিকে ফিরিয়া তাকায়।

মাঝপুকুরে নিভুর্ল বৃত্ত আঁকিয়া কচিৎ দুই একটা বড় মাছ ভাব দিয়া ওঠে। ক্রমবর্ধমান বৃত্তগুলি কয়েক মুহূর্ত পরেই অনন্ত জলরাশির বিরাট বিস্মৃতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। ঠাকুরঝি-পুকুরের পাড় ঘেঁসিয়া এক জোড়া সমর্থ খরসোল্লা মাছ জলের উপর দাগ কাটিয়া ছুটিয়া বেড়ায়। মালিনী অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে।

নিজন ঠাকুরঝি-পুকুর ঝিম্ ধরিয়া আছে। শ্যাওলা পড়া ঘাটের ভাঙ্গা সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া মালিনীর যেন মনে হয় কোন এক ঠাকুরঝি মেয়ের একখানা হাত কালো জলের গহীন হইতে তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।

যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে হাতভাঙ্গা চেয়ারটার উপর উবু হইরা বসিয়া কালীচরণ গভীর অভিনিবেশের সহিত নক্স-ভমিকার গুণাগুণ ও প্রযুক্ততা সম্পর্কে একখানি ডাক্তারি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। হঠাৎ 'মহাশয়' সম্বোধনে সচকিত হইয়া কালীচরণ বাহিরে দৃষ্টিপাত করে। কে? কেউ না। কালীচরণের দৃষ্টি আবার নতমুখী হইয়া নক্স-ভমিকার

অত্যাশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করিয়া ছুটিল: It can spell wonder in cases where the patient has been given up as lost. কালীচরণ পাঠ করিয়া চলে: Dr. Dumas says…

আবার সেই আহ্বান: মহাশয়, এটা কি অম্বিকাচরণ চক্রবর্তী মশায়ের বাড়ি?

ডাঃ ডুমাসের বক্তব্য বিষয় আর পাঠ করা হইল না। পদশব্দ শুনিয়া কালীচরণ এবার বেড়ার ফাঁক দিয়া বারান্দার উপর আগন্তককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সত্যই তো, ভদ্রবেশী কে একজন প্রৌঢ়ব্যক্তি। বারান্দার ঠিক কোণটায় পায়চারি করিতেছেন না! ঠিক ভদ্রবেশী বলিলে আগন্তকের অবশ্য যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ আগন্তক একটু বিশেষ ভদ্রবেশী, অন্তত ভদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবেশী বলিলে বংশলোচন কাঞ্জীলালের কতকটা পরিচয় দেওয়া হয়।

বংশলোচন আর্য বংশ সম্ভূত হইলেও অনার্যের মতো খর্বাকৃ ও কদাকার। তবে ঈষৎ পিঙ্গল চক্ষুদ্বয় আবার গোল বাধাইয়াছে। আপনারা হয়তো বলিবেন, ওটা প্রকৃতির খেয়াল। হয়তো তাহাই। কিন্তু বিচারটা একটু এক-তরফা হইয়া যায় না কি! বিশেষ অদ্বৈত বংশের সহিত নিজের যখন একটা সরাসরি যোগাযোগ আছে বলিয়া বংশলোচন দাবি করেন। মাথায় ব্রাহ্মণ্য তেজের প্রতীক স্বরূপ শিখা বা টিকি বতমান,

কিন্তু সেই সুদীর্ঘ টিকিটিকে পিছন দিক হইতে কৌশলে আয়ত্তে আনিয়া বংশলোচন মাথার টেরির সঙ্গে এমন নিপুণ-ভাবে মিশ খাওয়াইয়া দিয়াছেন যে, টিকিটি বাহ্যজগতে সচরাচর পরিদৃশ্যমান নহে। কারণ, এই ভড়ং জিনিসটা বংশলোচন একেবারেই পছন্দ করেন না।

বংশলোচনের পরনে আটপৌরে একখানা শাদা থান-ধুতি, গায়ে পাতলা ছোট্ট একখানা উড়ুনির চাদর—কাঁধ বেড়িয়া ভালোমন্দ দ্রব্য পরিপুষ্ট স্ফীতোদরের সবটুকু বেষ্টন করিতে গিয়া হঠাৎ যেন জিব কাটিয়া ফেলিয়াছে।

জঠরের দক্ষিণ অংশের আব্রু তো একেবারেই রক্ষা করিতে পারে নাই। ফল অবশ্য ভালোই হইয়াছে। বংশলোচনের ব্রাহ্মণ্যশ্রী দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ স্ফীতোদরের উপর মাঞ্জা দেওয়া যজ্ঞোপবীতটি মেঘের কোলে সৌদামিনী সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছে।

ব্রাউন রঙের একজোড়া হাতখানেকের ক্যাম্বিসের জুতার মধ্যে শ্রীচরণ ধরে নাই। জুতার ব্রহ্মরন্ধ্র ফুঁড়িয়া শ্রীচরণযুগলের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় নির্মমভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হাতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ, বগলে শাদা কাপড়ের ছাউনি দেওয়া রেলির বাড়ির ছাতা।

দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেই বংশলোচন কালীচরণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সেই একই প্রশ্ন করেন, দেখুন মশায়, এটা

কি অম্বিকাচরণ চক্কোত্তি মশায়ের বাড়ি? বংশলোচন চোখে সংশয় ও মুখে হাসি ফুটাইয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকেন।

ঘাড় নাড়িয়া মুশকিল আসান করিয়া কালীচরণ উত্তর করে, মহাশয়ের আগমন হচ্ছে কোথা থেকে?

বংশলোচন বলেন, আ-গ-ম-ন মানে সম্প্রতি আসছি অবিশ্যি আমি শিষ্যবাড়ি থেকে, তবে বাড়ি আমার ঢ্যাংঢেঙ্গের চর। চক্কোত্তির আমি খুড়শ্বশুর হই কি না!

এতক্ষণে রহস্য ভেদ হয়। কালীচরণ অমনি শশব্যস্তে শ্রদ্ধেয় আগন্তুকের পদধূলি লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু বংশলোচন হাত তুলিয়া থাক থাক বলিতে বলিতে এক পা পিছাইয়া এবং দুই পা অগ্রসর হইয়া কালীচরণের মাথায় আশীর্বাণী বর্ষণ করেন।

গৃহে পদার্পণ মাত্র যথাযোগ্য অভ্যর্থনার বিলম্ব হেতু ত্রুটি স্বীকার করিয়া কালীচরণ বলে, সেই কবে দেখেছি, সে কি আজকার কথা! ঠিক চিনে উঠতে···

কালীচরণের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বংশলোচন বলেন, আমিই কি আর চিনতে পেরেছি! সেই কতটুকু দেখেছি! তারপর সব কুশল তো! মালি-মাই কই! ভালো আছে তো?

বারান্দার উপর একখানি জলচৌকির উপর বসিয়া সম্মুখস্থ বাগিচার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলেন, অনেক বদলে গেছে দেখছি। আমি যেবার আসি তখন সামনে ফুলবাগানও ছিল

না, আর জেলা বোর্ডের রাস্তাও হয় নি। বর্ষাকালে হাঁটু সমান কাদাজল ভেঙ্গে চকোত্তির বাড়ি আসতে হতো। এখন বাড়ির সে চেহারাই নেই। সামনে একটা ডোবা মতো ছিল না! না সেই ডোবা বুজিয়ে এখানে ঘর উঠেছে বুঝি···হুঁ।

বারান্দার এককোণে অনাদৃত অবস্থায় বংশলোচনের ছাতা ও ক্যাম্বিসের ব্যাগটি এতক্ষণ পড়িয়াছিল। কালীচরণ ব্যাগটি যথাস্থানে রাখিবার জন্য তুলিতেই বংশলোচন একটু ব্যস্তভাবে বলিয়া ওঠেন, হ্যাঁ বাবা ঐ ব্যাগটি, একটু স্বতন্ত্রভাবে রাখতে হবে ; মানে ওতে নারায়ণ আছেন কিনা!

ভক্তপ্রবর বংশলোচন কাঙ্গালীলালের গুরুগিরি ব্যবসাটাকে ফলাও করিয়া তুলিবার নিমিত্ত স্বয়ং নারায়ণ যে বৈকুণ্ঠধাম ছাড়িয়া বংশলোচনের অপরিসর ক্যাম্বিসের ব্যাগটার মধ্যে শিলীভূত হইয়া আছেন, কালীচরণের তাহা বুঝিতে একটুও বিলম্ব হয় না। সশ্রদ্ধ একটি 'আচ্ছা' বলিয়া কালীচরণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে।

নিভৃত নিরালায় একান্তে বসিয়া বংশলোচন হাত দিয়া একবার কাছার গিঁটটা অনুভব করেন। না ঠিকই আছে। আঙ্গুল দিয়া টাকা কয়টির শির ধরিয়া মনে মনে গণিয়া দেখেন এক দুই তিন টাকা আর তলায় আছে একখানি দশ টাকা ও তিনখানি পাঁচটাকার নোট—একুনে আটাশ টাকা। ঠিকই আছে যা হোক। কিন্তু খুচরা কিছু যে কোঁচার খুঁটে বাঁধা ছিল!

বংশলোচনের চোখে আকস্মিক বিপৎপাতের ছায়া মুহূর্তে ঘনীভূত হইয়া ওঠে। ...না ঠিকই আছে। এ কি অধর্মের পয়সা যে হারাইলেই হইল। স্বস্তি বোধ করিতে যাইয়া বংশলোচনের অস্বস্তি বাড়ে। দুর্ভাবনার একটি কুটিল রেখা ভ্রূযুগলের মাঝখানে আবার কেন যেন দাগ কাটিয়া বসে। [illegible]টা চোখ দুইটি আরও ছোট হইয়া যায়। দূর্নীরিক্ষ্য একটা বৈষয়িক বুদ্ধির প্যাঁচ মাথায় যেন আসিয়াও আসে না। ছত্রভঙ্গ মেঘের মতো দুর্ভাবনার রেখাগুলি বংশলোচনের মুখের উপর ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িয়া আবার ঘনীভূত হইয়া আসে। অ[illegible]সের হাসি হাসিয়া অস্ফুটে বংশলোচন স্বগোতক্তি করেন, [illegible]তো, এখন তোর কপাল!

স্মৃতিপটে আসিয়াছিল বংশলোচনের অনূঢ়া কন্যা নয়নতারা। মালিনী বোধ করি ঘর নিকাইতেছিল, খবর শুনিয়া পড়ি কি মরি করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। সংসার-কর্ত্রীর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও ধীরতা হারাইয়া গাছ-কোমর কাপড় বাঁধিয়া মালিনী আসিল একজন খেঁদি বুঁচির মতো প্রায় নাচিতে নাচিতে— ট্যাংটেঙ্গের চরে বংশলোচনের গৃহ-পরিবেশের মধ্যে একদিন সে যেমন করিয়া চোর-পুলিশ খেলিত।

বাৎসল্য স্নেহে বিগলিত বংশলোচন উঠিয়া দাঁড়ান। কণ্ঠ কাঁপাইয়া বলেন, কে, মালি-মাই! মুখের চেয়ে চোখটাই বংশলোচনের বেশি হাসিতেছিল।

প্রণাম সারিয়া অভিমানের সুরে মালিনী জানায়—এতদিন পরে মনে পড়ল মেয়েকে ?

জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে বংশলোচন বলেন, মনে রোজই পড়ত মা! এখন বিয়ে দিয়েছি সাত সমুদ্র তের নদীর পার ; ইচ্ছে করলেই তো আর আসা যায় না!

মেঘলা ছেড়া জ্যোৎস্নার মতো মুখের হাসিটি না মিলাইতেই মালিনীর চোখে ভরিয়া আসে জল।

নিরাভরণা মালিনীর শ্রীহীন সৌন্দর্যের দিকে আর চাওয়া যায় না। বংশলোচন অন্যদিকে দৃষ্টি সরাইয়া নেন। এখন অদৃষ্ট বৈগুণ্যে মালিনীকে যদি বৈধব্য-জীবন যাপন করিতে হয় তিনি তাহার কি করিবেন! দোজবরে আজকাল কি মেয়েদের বিবাহ হইতেছে না!

বংশলোচনের কপালের উপর কাটা দাগটা আজও তেমনি আছে। কবে কাটিয়াছিল, কেন কাটিয়াছিল, মালিনীর আজও সব নিখুঁতভাবে মনে আছে। সামান্য একটুকরা জমির সীমানা লইয়া যতীন ঘোষের সঙ্গে প্রথমে বংশলোচনের একটু মন কষাকষি হয়। তারপর জরিপের সময় আসিলে বংশলোচন একদিন সকালবেলা প্রকাশ্যভাবে বাঁশগাড়ি করিতে যান। যতীন ঘোষের দল অমনি রুখিয়া আসে—খবরদার। খুড়ীমা ও সে নিজে বংশলোচনকে কত বুঝায়—একফালি জমির জন্যে আমরা তো আর ভিখিরী হয়ে যাচ্ছি নে! অধম করে নিক

না যতীন ঘোষ, ভগবান নেই? কিন্তু বংশলোচন কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' বলিয়া একখানা বাঁশের লাঠি বাগাইয়া যতীন ঘোষের দলের সম্মুখে হুঙ্কার ছাড়িয়া পড়িলেন। যতীন ঘোষের দলও ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল চতুর্দিকে। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া বংশলোচন নিজ পৈতা ছিঁড়িয়া যতীন ঘোষকে অভিসম্পাত দিলেন, 'স্ববংশে নিধন হও।' যতীন ঘোষের দল অমনি অট্টহাস্যে কাকার সে অভিসম্পাত তুচ্ছজ্ঞানে উড়াইয়া দিল। পেশিবহুল হাত দুইখানি ঝগড়াটে মেয়েমানুষের মতো ঘুরাইতে-ঘুরাইতে দাঁতে পিচ কাটিয়া যতীন ঘোষ বলিল, আরে ছো বামনা, শকুনের শাপে গরু মরে না!

ব্রাহ্মণকে শকুনি বলা! বংশলোচনের মাথায় যেন খুন চাপিয়া গেল। পাকানো বাঁশের লাঠিটাকে বার দুই-চার বিদ্যুৎবেগে বোঁ-বোঁ শব্দে পাক দিয়া বংশলোচন যতীন ঘোষের দলের সামনে লাফাইয়া পড়িয়া বলিলেন, তবে রে য'তে গয়লা, বামনার তাল সামলা!

বংশলোচনের তাল সামলাইতে য'তে গয়লাকে অবশ্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। অপটু হস্তের লাঠিটা যতীন ঘোষ খপ করিয়া বাঁ হাতে ধরিয়া ডান হাতের হাত-লাঠিটা সশব্দে বংশলোচনের কপাল লক্ষ্য করিয়া ঝাঁকিয়া বসাইল।

'ওরে বাবারে'—মাত্র একটি আর্তনাদ। বংশলোচনের ঘাড়টা

সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে নিজ বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল। সকলে ধরাধরি করিয়া বংশলোচনকে তখন বাড়ি লইয়া আসিলে মালিনীর সে কী কান্না! নয়নতারার মতো তিন দিন তিন রাত্রি দাঁতে দাঁত লাগিয়া পড়িয়াছিল। মালিনীর সব মনে আছে।

বংশলোচন সারিয়া উঠিলেন দেড়মাস পর। কোর্ট করিবেনই ঠিক ছিল, কিন্তু ডাক্তার-খরচ ও পথ্য বাবদ যতীন ঘোষ মোটা টাকা হেফাজত দিলে বংশলোচন গাঁইগুই করিতে লাগিলেন। যতীন ঘোষকে ডাকিয়া বলিলেন, জমির দখল ছাড়ো, গোলমাল চুকে যাক। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে একটা আপোস-রফা হয়—নয়নজুলির এপার হইতে যতীন ঘোষের রান্নাঘরের পিছনে নিমগাছ বরাবর বংশলোচনের জমির সীমানা ধার্য হয়। বহু অতীতের ঘটনা হইলেও মালিনীর চোখের উপর সব যেন ভাসিতেছে। বংশলোচনের কপালের ক্ষতচিহ্ন জুড়িয়া মালিনীর সুপ্ত শৈশব-চিন্তাগুলি স্তূপাকার মাছির মতো হঠাৎ ভন্ ভন্ করিয়া সমস্ত ঢ্যাংঢেঙ্গের চরের আকাশখানা ছাইয়া ফেলে।

কল্পনার অদৃশ্য ডানায় ভর দিয়া মালিনী শৈশবের স্মৃতি-বিজড়িত একান্ত পরিচিত স্থানগুলি ঘুরিয়া দেখে। বিশ্বাসদের কাঁচামিঠে আমগাছটা, রায়েদের ফুলবাগান, গ্রামের ভিজে-ভিজে সর্পিল রাস্তাগুলি যেন দূর হইতে তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে।

নারিকেলতেলসিক্ত সইএর কাঁচা মুখখানি মনে পড়ে, মনে পড়ে শ্যামসুন্দর শর্মার পাঠশালায় খেজুরের পাটির উপর বসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া 'গাছ মানে বৃক্ষ'—কথাটির শতাধিক আবৃত্তি। মনে পড়ে মিঠাইওয়ালী চেংড়ি বুড়ির মিষ্টি কথা। জলতেষ্টার ছুতা করিয়া চেংড়ি মাসির কাছে এক গ্লাশ জল চাহিলেই বুড়ি জোর করিয়া মালিনীর হাতে ছুইটা রসগোল্লা গুঁজিয়া দিত। বলিত—শুধু জল খাবি কেন লো নাতনী; দেখ দিনি কেমন হয়েছে! ফোকলা পড়া টোল খাওয়া মুখে 'রসগোল্লা' কথাটির শুদ্ধ উচ্চারণ বাহির হইত না; চেংড়ি মাসি বলিত, 'দসোগোল্লা।' মালিনীর এমন হাসি পাইত!

বংশলোচন মালিনীর তন্ময়তা লক্ষ্য করেন। পিতৃমাতৃহীন এই অসহায় মেয়েটির ভাগ্য লইয়া যে কোন অপদেবতা ছিনিমিনি খেলিতেছে, বংশলোচন বৃথাই তাহা নিরাকরণের চেষ্টা করেন। অধীত শাস্ত্রজ্ঞানে দুষ্ট গ্রহের কুটিল চক্রান্ত ধরা পড়ে না। বলেন, আয় মা কাছে এসে বোস।

সেই স্নেহের আহ্বান! মালিনীর মনে পড়ে, জজমান বাড়ির পূজা-পার্বন সমাধা করিয়া স্নান আহারান্তে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের সময় কাকা তাহাকে এমন কতদিন কাছে ডাকিয়া লইতেন। বলিতেন, ছেলেকে ঘুম পাড়াতে এস মা!

বহুকর্মী সংসার-কর্ত্রীর বিরক্তি মুখে ফুটাইয়া ছোট্ট লাল শাড়ির আঁচলখানা চাবির গোঝা সমেত পিঠের উপর ঝনাৎ করিয়া

পাক ফেলিয়া সে বলিত, আর পারিনে বাপু। একটু চোখের আড় হয়েছি কি ছেলে একেবারে···দেখি কাত হয়ে শুয়ে চোখ বোজ! বংশলোচনের অভিনয়ও নিখুঁত হইত। বাধ্য ছেলেটির মতো কাকাও তাহার কাত হইয়া চোখ বুজিয়া শুইতেন; আর সেও নানা ছন্দে ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া কাটিয়া কাকার গালের উপর মৃদু-মৃদু করাঘাত করিত! কাকার শরীরে চাঞ্চল্যের ক্ষীণতম আভাস পাইলে ধমকাইয়া বলিত, ও—ও—ছেলে! ডাকবো জুজুবুড়িকে! ভীত সন্ত্রস্ত শিশুর মতো কাকাও অমনি কুঁকড়াইয়া জড়সড় হইয়া শুইতেন, যেন কতই না ভয় পাইয়াছেন। কতদিনের কথা, তবু মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা।

মালিনী বংশলোচনের পায়ের কাছে আসিয়া বসে। সংসার-কর্ত্রীর উচ্চপদে বসিয়া এখন সে আর শাসন করিতে চাহে না, শাসিত হইতে চায়। এক বিন্দু স্নেহ ভালোবাসার জন্যে তাহার অন্তরাত্মা তৃষ্ণার্ত চাতকিনীর মতোই উর্ধ্বমুখী হইয়া থাকে। অকারণে দুই চোখ ছাপিয়া ভরিয়া আসে জল।

অভিব্যক্তিহীন পরোক্ষ দুঃখে বংশলোচন বড় একটা বিগলিত হন না, কিন্তু যে দুঃখ প্রত্যক্ষভাবে দুঃখীর দুই চোখে অঝোরে ঝরে তাহাতে বংশলোচন সত্যই বড় বিব্রত বোধ করেন। মালিনীর মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলেন, এহে: এটা কি করিস। আবার কান্নাকাটি কেন!

রৌদ্র-দগ্ধ বিশুষ্ক বসুধার উপর এক পশলা বৃষ্টি হইলে মাটির বুক হইতে যেমন একটা উষ্ণ-শ্বাস বাহির হইয়া যায়, ক্ষণিক স্নেহের স্পর্শে মালিনীর বুকের ভিতরটিও তেমনি অব্যক্ত অন্তর্দাহে হু-হু করিয়া ওঠে। বংশলোচনের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া মালিনী শিশুর মতো ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে।

বংশলোচন কি বলিয়া মালিনীকে সান্ত্বনা দিবেন! মালিনীর মাথায় শুধু সস্নেহে তিনি হাত বুলাইয়া দেন।

আজকাল অতি দুঃখেও চোখে যেন কেন জল আসে না বংশলোচনের, কটা চোখ বড় জোর একটু লালচে হয়।

আর চোখ দুটি তো কম দেখিল না! এমনও একদিন ছিল যেদিন এই দুইটি চোখই আবার কথায়-কথায় ছলছল করিয়া উঠিত; সামান্য ক্ষতিতে হাপুস-নয়নে কাঁদিত—আর এখন! এখন শুধু সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আগাপাছতলা লক্ষ্য করে আর মিট-মিট করিয়া হাসে; যেন সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্যটাই বংশলোচনের দুইচোখে একেবারে ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

বংশলোচনের গলা কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, চোখ হয় রক্তাভ। বলেন, এই তো সেবার একরকম আসবই ঠিক ছিল। তোর খুড়ীমাও বললে, বলি ঐ দিক পানেই তো যখন যাচ্ছ তখন ফেরবার পথে মেয়েটাকে একবার বলে-কয়ে নিয়ে এসো। সবই ঠিকঠাক, নৌকোও একখানা আগে থেকে ঠিক করে রাখলাম। এই রাতখানা কোনোমতে কাটিয়ে পরদিন ভোর-

ভোর যাত্রা করব আর কি! তা মনে ভাবি এক, হয় আর এক। আমি তো থাকি নানান তালে ব্যস্ত, কতদিকে দেখব। বারোয়ারি কালীতলায় পূজো সেরে সন্ধ্যা বেলা বাড়ি ফিরে দেখি, বিশু শুয়ে আছে। বললাম, বলি লক্ষ্মীছেলের মতো শুয়ে আছিস যে বড়, পড়তে গেলি নে আজ! বললে, শরীরটা খারাপ লাগছে, আজ পড়তে যাব না বাবা। কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখি, গা-টা একটু গরম-গরম। বললাম, তো থাক শুয়ে। এখন, একটু জ্বর হলে সঙ্গে-সঙ্গে কে আর ডাক্তার ডাকে বলো!—রাতও পোয়ালো না, এই ভোর-ভোরের সময় সব শেষ হয়ে গেল।

পরের সর্বনাশে নিজ সর্বনাশের দাহ কমিয়া যায়। মানুষের দুঃখের প্রতি মানুষের এই স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ থাকাতে একজন আর একজনের কাছে শুধু স্বার্থপরের মতো কাঁদিতে পারে না। অপরকেও সান্ত্বনা দিতে চায়। তাই চরম দুঃখেও আমরা ভাঙ্গিয়া পড়ি না; শোক-দুঃখের জগদ্দল পাষাণ বুকে বাঁধিয়া পরস্পর পরস্পরকে সান্ত্বনা দিয়া বেড়াই।

মালিনীর উচ্ছল শোকাবেগ এই প্রতিঘাতে আপনা হইতেই সংযত হইয়া আসে। জলভরা দুই ডাগর চোখের করুণ চাহনি মেলিয়া মালিনী বংশলোচনের মুখের দিকে তাকাইয়া বলে, বিশু নেই!

মালিনীর কণ্ঠে সংশয় থাকিলেও বংশলোচন ইহার উত্তরে আর

কি বলিবেন। হুঁঃ!—একটি হ্রস্ব শব্দ করিয়া বংশলোচন শুধু ঘাড় নাড়েন। ওষ্ঠপ্রান্তে একটি প্রাণহীন ক্ষীণ হাসির ছায়াপাত হয়। উদ্গত শোকাবেগ নিরেট অভিজ্ঞতার ছোঁয়াচে আপনার বেগে ফাটিয়া পড়িতে পারে না।

বিশুকে মালিনীর ভালো মনে পড়ে না। বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ি আসিবার সময় বিশুকে সে দেখিয়া আসিয়াছিল মাত্র মাস কয়েকের এক ফোঁটা শিশু। বড় ঘরের বারান্দায় দড়ির দোলনায় শোয়াইয়া খোকাকে দোল দিত সে। খোকা ঘুমাইলে দোল দেওয়া বন্ধ করিয়া খোকার মাথার কাছে চুপি-চুপি আসিয়া দাঁড়াইত। চোখমুখে ফুটিয়া উঠিত একটা চাপা কৌতুকের হাসি। মালিনীর ভাবসাব লক্ষ্য করিয়া বংশলোচনের স্ত্রী নিস্তারিণী সকড়ি হাতে ঘুরিয়া দাঁড়াইতেন, ভ্রূ কুঁচকাইয়া প্রশ্ন করিতেন: দেখিস কি লো!

বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া উচ্ছল হাসির বেগ দাঁতে চাপিয়া মালিনী হাতছানি দিয়া খুড়ীমাকে কাছে ডাকিত—শিগগির দেখবে এসো ছেলের কাণ্ড!

নিস্তারিণী কিন্তু বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। পূর্বের মতো কথায়-কথায় এখন তাঁহার নাকি আর সোহাগ আসে না। শিশু প্রকৃতি তো তাঁহার আর অজানা নাই। উচ্ছিষ্ট বাসনের পাঁজা অভ্যাসমতো ডান হাতের তালুর উপর বসাইয়া নিস্তারিণী বলিতেন, কি, হাসছে তো! অ্যাঃ! ও দেখগে তুই!

ঘুমন্ত শিশুর মিষ্টি হাসিটুকু নিস্তারিণীর কাছে একঘেয়ে ঠেকিলেও মালিনী বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘুমন্ত শিশুর হাসিকান্না লক্ষ্য করিত। হঠাৎ ঘুমন্ত খোকা হাসিতে-হাসিতে চমকাইয়া কাঁদিয়া উঠিত। মালিনী অমনি দোলনার উপর উপুর হইয়া খোকাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া চুমায়-চুমায় বিব্রত করিয়া তুলিত। ছড়া কাটিয়া বলিত, নিদন্তের হাসি আমি বড়ই ভালোবাসি। আট দশ বছর আগেকার কথা ; মালিনীর কিন্তু সব মনে আছে। দিনের মতো সুন্দর একটি শিশুর মিষ্টি হাসিটুকু সহসা তাহার মনের আর্শিতে কেমন যেন ম্লান হইয়া যায়। মালিনীর চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে একখানা পাংশু বিবর্ণ কচি মৃত মুখ।

ডান হাতের তালুতে মুখ লইয়া বংশলোচন স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। কি বলিবেন, আর কিই বা বলিবার আছে। বিক্ষিপ্ত অশরীরী চিন্তার পিছু পিছু দৃষ্টি তাঁহার শূন্যে উধাও। এই এক কথা ভাবিতেছেন আবার পরক্ষণেই কিছুই ভাবিতেছেন না; শূন্য কলসীর মতো মনটা মাঝে মাঝে ফাঁকা হইয়া যাইতেছে।

সংসারে কত দায়িত্ব কত চিন্তার বিষয় থাকা সত্ত্বেও মনটা যে কেন এই রকম মাঝে মাঝে পাণিপাত্র দিগম্বর সাজিয়া বিবাগী হইয়া যায় তাহা কে বলিবে !

খুড়ীমার শরীর ভালো আছে তো ?—ভিজে ধরা গলায় মালিনী প্রশ্ন করে।

স্বপ্নোত্থিতের মতো বংশলোচন বলিয়া ওঠেন, অ্যা—হ্যাঁ, শরীর আর তেমন ভালো কই! আজ এটা কাল ওটা, এ তো বারোমাস তিনশ পয়ষট্টি দিন লেগেই আছে।

জানুতে বংশলোচনের বোধ হয় হঠাৎ শিরটান ধরিয়াছিল। অতিকষ্টে পা-খানা টান টান করিয়া বিকৃত মুখে কথার জের টানিয়া বলিলেন, ভাতও খায় জ্বরও আসে।

আঃ—পা ছড়াইয়া বংশলোচন সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়েন।

—তারা! তারা কেমন আছে!

—তারা ভালোই আছে। মেয়ে বড় হলে যে কি চিন্তা! মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে ভেবে তারার মায়ের চোখে তো ঘুমই নেই। এদিকে বিয়ে দেওয়াও তো চাড্ডিখানি কথা নয়। কি করে যে কি করি!

—হ্যাঁ তা তের-চোদ্দ বছর তো বয়েস হলো! তা হলেও দু-এক বছর এখনও রাখা যায়: মালিনী বংশলোচনকে আশ্বাস দেয়।

—সে কথা বললে কে শোনে মা! এর মধ্যেই পাড়ার লোক শুনি নানান কথা বলতে আরম্ভ করেছে। স্বাস্থ্য ভালো, বাড়ন্ত গড়ন, তাদের মুখই বা বন্ধ করি কি দিয়ে। বয়স কম তো তাদের কি এলো গেলো। তারা তো বলেই খালাস।—বংশলোচন মালিনীর দিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়েন।

—ছেলে দেখছেন নাকি!

—ছেলের তো অভাব নেই মা; কত ছেলেই তো দেখলাম।

কিন্তু হয় কই! ছেলের পছন্দ হয়তো ছেলের বাপের খাঁই মেটে না। আমাদের মতো লোকে পেরে উঠবে কেমন করে বলো!

বাহির হইতে কে যেন বলিয়া ওঠে, দা-ঠাউর আছেন নাকি।

মালিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। স্মিতহাস্যে কাকাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া বলে, চলুন আমরা ভেতরে যাই। আগন্তুক সম্বন্ধে বংশলোচন ঘাড় নাড়িয়া কৌতূহল প্রকাশ করিলে মালিনী বলে, কি জানি কে না কে। দিনরাত অমন কত লোকই তো আসছে। চলুন, হাত পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আপনি একটু বসবেন চলুন কাকা!

চল—হৃষ্টমনে বংশলোচন মালিনীর অনুগমন করেন।

তেরো

রাত এখন কত? আখড়ায় এখনও আলো জ্বলিতেছে। নামসঙ্কীর্তন তো থামিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। পদ্মাবতীর কি এখনও আসিবার সময় হইল না! কি জানি কি আছে তার মনে। মালিনী সন্তর্পনে দরজার খিল খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়। মণ্ডপ ঘরের দিকে একবার উঁকি মারিয়া দেখে, ঘর অন্ধকার। কালীচরণ এত তাড়াতাড়ি আজ যে শুইয়া পড়িল! দূরে নিশ্বরণ চৌকিদারের হাঁক শোনা যায়—চেতন! নাঃ, রাত তো কম নয় তাহা হইলে! পদ্মাবতী কি রকম মানুষ! আকুল আগ্রহে মালিনী পদ্মাবতীর পথ চাহিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকে। দুর্বল হাতখানি ঘরের খুঁটির গা বাহিয়া নিচে ঝুলিয়া পড়ে। মাথাটা কি রকম ঝিম-ঝিম করে মালিনীর।

দিগন্তবিসারী অন্ধকারের পর্দার উপর সহসা যেন রক্তবর্ণ কৌষিক বসন পরিহিতা যোগিনী পদ্মাবতীর অপরূপ মূর্তি ফুটিয়া ওঠে, আর দেখা যায় অনুরাগে করুণ দুইটি স্থির চক্ষু—ঔদাসীন্যের ভস্ম মাখিয়া এতদিন যারা মালিনীর দিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই। বাস্তবিক কালীচরণ আজ কি নিরুপায়!

মালিনীর চোখে জাগে বিজয়িনীর উল্লাস, ঠোঁটের কোণে এক টুকরা হাসি সহসা ছুরির ফলার মতো চক্‌চক্‌ করিয়া ওঠে। পলক পড়িতেই সব মিলাইয়া যায়। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন দ্রুততালে নাচিয়া ওঠে। নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মালিনী আপন মনে বলিয়া যায়, পদ্মাবতী এসো—পদ্মাবতী এসো। কোথায় পদ্মাবতী!

আবার জাগে সংশয়! একটা আচ্ছন্নকারী হতাশার ভাব যেন সর্পিলগতিতে মালিনীর সর্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলে! কেমন যেন ঘুম-ঘুম পায়। ব্রতচারী মালিনীর সুন্দর মুখখানির উপর আহত মনের পাণ্ডুর ছাপ পড়ে।

আকাশে চাঁদ নাই; তবু তার মুখখানি এখন মনে হয় যেন কোন সাধক শিল্পীর সর্বসুলক্ষণা স্বপ্ন প্রিয়ার মহিমায় সমুজ্জ্বল।

দূর হইতে শোনা যায় ঘুমন্ত কালীচরণের স্বাস্থ্যকর নাসিকাধ্বনি, কল্যকার সংগ্রামের জন্য শক্তিসঞ্চয় করিতেছে।

বড় ঘরের মধ্যে কে যেন কথা বলিয়া ওঠে। উৎকর্ণ মালিনী সংযোজিত জ্যার মতো চকিতে সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া। কে? কে আবার হইবে! বংশলোচন যেমন তেমনই ঘুমাইতে-ছেন। ঘুমের ঘোরে কাকা তার কথা বলে নাকি! হইবেও বা। সুদীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে বংশলোচন যে কত বদলাইয়াছেন মালিনী তার কি জানিবে!

রাত্রি গভীর। অন্ধকারের পঙ্কিল স্রোতে বিশ্বভুবন সমাচ্ছন্ন—

বিধ্বস্ত। হাত বাড়াইলেই মনে হয়, খানিকটা তেলচিটে অন্ধকার চামড়ার সঙ্গে লেপটাইয়া যাইবে। কতক্ষণ আর ঠায় দাঁড়াইয়া থাকা যায়! অন্ধকার যেন নাকমুখ চাপিয়া ধরে। মালিনী ঘরে ঢুকিয়া দরজায় আবার খিল আঁটিয়া দেয়। শুইলে পাছে ঘুম আসে, মালিনী বসিয়া থাকে তাই। কথাই তো আছে, পদ্মাবতী আসিয়া দরজায় তিনবার টোকা মারিবে। আনকোরা লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া তাহাকে কেমন মানাইয়াছে একবার আয়নায় দেখিবে নাকি? বুকটা মালিনীর কেমন যেন কাঁপিয়া ওঠে। সাহস হয় না। কোরা কাপড়ের কি বিশ্রী বোটকা গন্ধ···আর কি ছাই গায়েই থাকে!···নাঃ, বসিয়াই যদি থাকা তো দরজা খুলিয়া রাখিতে দোষ কি! সাটসুটের কথা পদ্মাবতীর যদি মনে না থাকে! খিল খুলিয়া মালিনী দরজার কবাট দুইখানা আলগোছে ভেজাইয়া রাখিয়া আসে। কিন্তু কি বে-আক্কেলে মানুষ পদ্মাবতী! শেষে কি সে তাহার··! না না, তা সে পারে না, পদ্মাবতী সে রকম মানুষ নয়। মালিনী মানুষ চেনে না নাকি! হাত-আর্শিটা তো সামনেই পড়িয়া আছে, লাল ঘোমটা টানিয়া মুখখানা একবার তো সে দেখিলেও পারে! ত্রস্ত পুলকে মালিনীর সারা অঙ্গ বার বার শিহরিয়া ওঠে, চোখে মুখে একটা ভীরু কৌতুকহাসি ফুটিয়া ওঠে। দৃঢ় মুষ্টিতে মালিনী হাত আর্শির হাতলটা আঁকড়াইয়া ধরে। সহসা ক্ষীণ আর্তনাদ করিয়া

দরজাটা ঈষৎ উদারভাবে খুলিয়া যায়। অন্ধকারের ভিতর হইতে শোনা যায়, অস্পষ্ট আহ্বান-সঙ্কেত, মালিনী নজর করিতেই দেখে, রক্তাম্বর বসনপরিহিতা পদ্মাবতী হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। ফুঁ দিয়া তেলের প্রদীপটি নিভাইয়া দিয়াই মালিনী পলকে অন্ধকারে মিলাইয়া যায়।

তারপর গ্রামের সেই সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের পাদমূলে ত্রিমুখী পথের কেন্দ্রস্থলে যোগাসনে বসিয়া পদ্মাবতী মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

মধ্যরাত্রে শিবাকুল যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় যাম ঘোষণা করিবে ঠিক ততক্ষণ সময়ের মধ্যেই সমুদয় কার্য সমাধা করিতে হইবে, নচেৎ মন্ত্র ফলবতী হইবে না। অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সব কিছুই প্রস্তুত। পদ্মাবতীর সম্মুখস্থ ধুনিটাও আশু দাহ্যমান কাষ্ঠে সজ্জিত। মালিনীও যোগাসনে বসিয়াছে। তাহার সম্মুখে কালীচরণের কুশপুত্তলি—সদ্য-কর্তিত কচি কদলীপত্রে সযত্ন-রক্ষিত। পদ্মাবতী ধ্যানমগ্ন, মালিনীর উৎকণ্ঠার অন্ত নাই।

অদূরে শ্মশান-প্রাঙ্গনে যজ্ঞেশ্বর ডোমের দাওয়ায় জ্বলে একটা কেরোসিনের ডিবরি। ডিবরির অস্পষ্ট আলোকে দেখা যায়, যজ্ঞেশ্বরের থুড়থুড়ে বুড়ী মা নিবিষ্টমনে মাথার উকুন বাছিতেছে আর থাকিয়া-থাকিয়া আপন মনে বক্‌-বক্‌ করিতেছে। বুড়ীর মাথার অসুখ আছে, রাত্রে ঘুমায় না। কেরোসিনের ডিবরি

সামনে জ্বালাইয়া এই রকম তিনশো পঁয়ষট্টি দিন মাথার উকুন বাছে।

ফণীমনসা গাছতলায় ভস্মমাথা খোট্টা সাধুটা উদাত্তকণ্ঠে বোম্ বোম্ করিয়া উঠিল। এত রাত্রে আবার গাঁজায় দম চড়াইয়াছে। যজ্ঞেশ্বরের মায়ের ইচ্ছা হয়, মাথার উকুনের মতোই ঐ নাঙ্গা বাবাজীকে দুই নখের মধ্যে ফেলিয়া টিপিয়া মারে। বেটার বউ সনকাকে বাবাজী 'আও বেটি' বলিয়া সম্বোধন করিলে যজ্ঞেশ্বর চরিতার্থ হইয়া যায় কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের মায়ের ছোট দুইটি কটা চোখ দিয়া যেন আগুনের ফুলকি উড়িতে আরম্ভ করে। ক্রুদ্ধ গৃধিনীর মতো সে তাহার শীর্ণ হাত দুইখানি মাটিতে আছড়ায় আর সনকাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া যজ্ঞেশ্বরকে সমঝাইয়া দিবার চেষ্টা করে। মোহাচ্ছন্ন যজ্ঞেশ্বর কিন্তু দূর-দূরান্ত হইতে নিত্য-নূতন চেলাচামুণ্ডা ধরিয়া আনিয়া বাবাজীর আখড়ায় হাজির করে। যজ্ঞেশ্বরের মতে সে ঠিকই করে। বিনামূল্যে ভরপেট মদ খাইবার সৌভাগ্য ইতপূর্বে তাহার আর কবে হইয়াছে? আর তা ছাড়া, জেলেপটির খুকির মায়ের ভালোবাসা তাহার প্রতি তো অমলিনই রহিয়াছে, বিশেষ বাবাজী যখন কথা দিয়াছেন থাকিবেও, তখন যজ্ঞেশ্বরের আর কি চাই! সনকা! এত রূপগুণ লইয়াই কি সনকা যজ্ঞেশ্বরের উপযুক্ত ঘরনী হইবার দাবি করিতে পারে না? যজ্ঞেশ্বর এ-কথার কোনো জবাব দেয় না। চাপিয়া ধরিলে

বলে, বেশ তো আছি বাবা, কেন মিছে ঘাঁটাও! পাষণ্ড যজ্ঞেশ্বর।

ঘনবন পরিবেষ্টিত বটবৃক্ষমূলে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সব কিছুই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মতো অন্ধকারে দুর্নিরীক্ষ্য; নিকট ও দূরের আপেক্ষিকতা তত্ত্বসার, অর্থহীন। পদ্মাবতী ও মালিনীর মাঝখানে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের প্রাকার, একজন আর একজনকে দেখিতে পায় না। দর্শনেন্দ্রিয়ের জরুরি তারের উত্তরে মগজ হইতে জবাব আসে, হ্যাঁ, তার পাইয়াছি। নিশ্চিন্ত থাক। তোমার সামনেই পদ্মাবতী যোগাসনে বসিয়া তোমারই ভবিষ্যত মঙ্গল বিধান করিতেছে। মালিনী আশ্বস্ত হয়।

রাত্রির তৃতীয় যাম উত্তীর্ণ হইয়া যায়। নির্বিঘ্নে কুযোগ সমাধা করিয়া পদ্মাবতী ফোঁস-স্-স্ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে—বলে, মেয়ে কই!

মালিনী ত্রস্ত উত্তর করে—কি, এই তো।

—কথা বলিস না যে।

—কি বলব বলো।

—হুঁ।

তারপর আর কেউ কোনো কথা কয় না। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা আবহ রে-নি-রে-নি সঙ্গীত খাদ হইতে নিখাদে দোল খাইয়া আবার উচ্চগ্রামে বাজিয়া ওঠে।

চারদিক নিঃঝুম নিস্তব্ধ।

গুণ গুণ শব্দে পদ্মাবতীর গান শোনা যায়। আর চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব। কৌতূহলী মালিনী প্রশ্ন করে :

—মাসি!

—এট্টু রও।

পদ্মাবতীর গান আর শোনা যায় না। গা...র সলজ্জ ফিসফিসানি নিস্তব্ধতাকে আরও গম্ভীর করিয়া তোলে। অত্যুগ্র আগ্রহে মালিনীর শ্বাসপ্রশ্বাস হয় ঘনভূত। বিধ্বস্ত স্নায়ু কানে বাজায় পরিশ্রান্তির বাঁশি –পিঁ ···। এই দুঃসহ অখণ্ড নীরবতাকে মালিনীর মনে হয় কর্কশ চিৎকারে খান্ খান্ করিয়া ফেলে। আবার পদ্মাবতীর গলা শোনা যায়। গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছে না, কি একটা ছড়া কাটিতেছে :

কার কথা বা কি না জানি
পত্রের আবডাল কাপড়খানি।

এবার মালিনী আবদার ও ক্ষোভের সুরে ঝঙ্কার দিয়া ওঠে, মাসি।

—কি বলো।

—কি বলব! বলিয়া বলে, কি করবে বলে এলে তার কি হলো। পদ্মাবতী সহাস্য উত্তর করে, ও, এই কথা। নাও তো চল এইবার।

—কি চল!

—তবে থাক আমি যাই।

দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া পদ্মাবতী আবার ফিরিয়া দাঁড়ায়। বলে, কি হলো! মালিনী উত্তর করে না।

পদ্মাবতী হাসিয়া বলে, হওয়া বলে হওয়া। এমন হওয়া আর কারো বেলায় হয়নি। রাত আর বেশি নেই, পা টেনে চল এইবার।

মালিনী আবেগ ভরে পদ্মাবতীকে দৃঢ় বাহুবন্ধনে বেষ্টন করিয়া গদগদ স্বরে বলে, মাসি!

পদ্মাবতী মন্ত্রপূত শিকড়টি মালিনীর হাতে দিয়া বলে, এই নে, থেঁতলে ডাল-তরকারির সঙ্গে মিশিয়েই পারিস আর যেমন করেই পারিস এটা খাইয়ে দিস। আর এই দ্যাখ—পদ্মাবতী মালিনীর হাতে কালীচরণের কুশপুত্তলিটি দিয়া বলে, এটা কিন্তু কখখনো কাছছাড়া করিসনি। শনের সুতোয় শক্ত করে বেঁধে কোমরে ধারণ করিস।

—কতদিন ধারণ করতে হবে!

—যতদিন না···

—ও বুঝলাম।

পদ্মাবতী হাসিয়া বলে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। রাত আর নেই। চল পা টেনে চল। আমার আবার গোপাল ভোগের সময় হয়ে এলো।

কৃত্রিম প্রত্যুষের ক্ষণিক ধূসরতাকে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া নৈশ অন্ধকার আরেকবার চরাচর সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

চোদ্দ

এখন যেন আর কিছুই করিবার নাই। শুধু দূর হইতে স্খলিত উপল-খণ্ডের অনিবার্য পতন বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে সদ্য প্রত্যক্ষ করিয়া নয়ন সার্থক করা নয়, আঁতকাইয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে ঠাণ্ডা নীল হইয়া পড়া। এমনই সুন্দর ভীষণ যেই অবস্থা। মঙ্গল অমঙ্গল সব কিছু ভুলিয়া এখন যেন একটা ঝোঁকের মাথায় ঘর-তুয়ার ফেলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে সামনে ছুটিয়া চলা, বিরাট বিশৃঙ্খলার মিছিলে প্রত্যেকটি বিধিনিয়ম হাসিয়া অর্থহীন করিয়া দেওয়া।

সেই অশরীরী মিছিলের বলিষ্ঠ পদধ্বনিই বুঝি বা মানুষের হৃৎপিণ্ডে বাজে। যোজন যোজন বিস্তৃত ফাটা মাঠের আকাশে বুঝি সেই অদৃশ্য শক্তির প্রেত বাতাসের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ফেরে সাঁই সঙ-ঙ-ঙ। প্রশস্ত চরের বুক জুড়িয়া সদ্য অঙ্কুরিত পাট চারার পাতা হলদে হইয়া যায়। বিশুষ্ক ডোবার পাঁকের উপর ল্যাঠা মাছ বুক দিয়া পিছলাইয়া চলে, হালের বলদের কাঁধে দগদগে চাকা ঘা জুড়িয়া মাছিরা স্তূপাকার হইয়া বসিয়া থাকে—বলদরা লেজও নাড়ে না। অফিস-কাছারির গেটের

লোহার শিক আঁকড়াইয়া বুভুক্ষু মানুষের দল ডাল ভাতের দাবি জানায়, খাজনা বৃদ্ধির অভিযোগ করে, সমস্বরে চেঁচাইয়া বলে, লাঙ্গল যার জমি তার। সঙ্গে সঙ্গে গেটের ওপার হইতে ফাটিয়া পড়ে সমুদ্ধত তর্জনীর দৃকপাতহীন আস্ফালন—Back, back, you philistines there are still leaves in the trees. ফিরিয়া আসে নিরন্ন জনসাধারণ—ভুঁখা বাঙ্গলার চাষী মজুর, ছুতোর কামার পটুয়া আর জেলে মাঝির দল। অক্ষমতার আক্ষেপটুকু হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনে যেন শত ধিক্কারে বাজিয়া ওঠে। বড় বড় নোংরা দাঁতগুলি যেন মুখের মধ্যে আক্রোশে চাপিয়া গুঁড়াইয়া যায়। ক্ষুধিত চোখের হিংস্র দৃষ্টি যেন সাত সমুদ্র তের নদী পারে হন্যে হইয়া ছুটিয়া চলে।

শীতের বিষণ্ণ সকাল। কুয়াশার চাদর সর্বাঙ্গে জড়াইয়া বৃদ্ধা পৃথিবী মাঘের শীতে আড়ষ্ট হইয়া আছে। উত্তর বাতাসের দোলা লাগিয়া নিচের বনস্থলীর উপর আম সুপারি গাছের মাথা হইতে টুপটাপ ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে। মাঠ ঘাট পার হইয়া দলে দলে ছাতার পাখিরা লোকালয়ের দিকে উড়িয়া চলিয়াছে—যেন আর একদল বুভুক্ষুর নিরুপায় অভিযান। উপরের বাঁশগাছের শীষে সকালবেলা ফিঙ্গের বাচালতা খানিকটা খিস্তির মতোই শোনায়। নিচে বিস্তীর্ণ গোচরের বুকের উপর দেখা যায় একটা পাতলা ধোঁয়ার অস্পষ্ট ইশারা। ঠাণ্ডা মাটির জঠরে মনে হয় যেন আগুনই জ্বলিতেছে।

চাষী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কতকগুলি জরুরি ইস্তাহার বিভিন্ন মহলে বিলি করা সম্পর্কে কালীচরণ মনে মনে একটা খসড়া করিতেছিল। হঠাৎ পিছন দিক হইতে এক তাড়া চিঠি হাতে করিয়া হাজির হইল সুনন্দা। হাসিয়া বলিল, সব কিছুতেই শেষ করতে পারলাম না কালীদা, মাত্তর পঞ্চাশখানা লিখেছি। সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবেদনপত্রের পঞ্চাশখানা নকল নির্ভুল ভাবে লিখিয়া দেওয়া কম কৃতিত্বের কথা নহে।

সুনন্দার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া কালীচরণ বলে, পঞ্চাশখানা লিখে ফেলেছো !···ঘুমোওনি নিশ্চয়ই রাত্রে।

—বারে, ঘুমোলে লিখবো কখন ! কালকে বিকেলবেলা দেবার কথাই তো বলে দিলে, রাত না পোয়াতেই নকল চাই। তা কখন লিখবো !

—তাই বলে সারা রাত জেগে কিন্তু আমি একটিবারও বলিনি তোমায়।

—না তা কেন বলবে। ডাক ছাড়বার সময় তোমার কেবল পঞ্চাশখানা নকল পেলেই হলো।···খুব খাটিয়ে নিতে পারো লোককে তুমি-কালীদা।

—তা সে কথা তো আমি আগেই তোমাকে বলেছিলাম যে, ও সব নকল করা তোমার একার সাধ্যি হবে না সুনন্দা—রেখে দাও কাগজপত্তর ; তা তো তুমি শুনলে না তখন।

—সাধ্যি হবে না—হলো তো।

—ঐ তো হলো। সারা রাত জেগে হলো।

—তা কি করবো! না করে দিলে তো আবার নিজেকেই সারা রাত বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে লিখতে হতো ঐ কাগজগুলো। তারপর একটা অসুখ-বিসুখ করলে কে দেখতো শুনি!

—কেন তুমি!

—ওঃ আমার ভারী দায়ই পড়েছে।

—আচ্ছা তারপর পড়ো দেখি কি লিখলে!···নিচে চাষী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের নামটা লিখেছো তো মনে করে।

—হ্যাঁ, একদম নিচে ঐ নামে স্বাক্ষর দিয়েছি।

—ঠিক আছে, এইবার পড়ো তো একবার শুনি কি লিখলে।

—ঐ তো ছেঁটে-কেটে কালকে যেটা দাঁড় করালে আর কিং শেষকালে!

—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে তুমি পড়ো।

সুনন্দা পড়িয়া চলে :

ভাই সব,

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ কলাকোপা মহকুমার অন্তর্গত পীরপুর, রত্নখালি, বরাটনগর ও দিঘিরপাড় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ আবাদী জমি সেচ ব্যবস্থা অভাবে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছে। এই দুর্বৎসরেও যদি উক্ত জমিতে সেচ ব্যবস্থার কোনো বন্দোবস্ত করা না হয় তাহা হইলে চাষ-আবাদ বন্ধ হইয়া

গৃহস্থেরা ধনে প্রাণে মারা পড়িবে। এখন সূজা নদীর খাল কাটা না-কাটার উপর এবার উক্ত মৌজার সমুদয় চাষীর জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। ইতিপূর্বে কর্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়ে আবেদন নিবেদন করিয়া কোনোই সুফল দর্শায় নাই। এতদ্ভিন্ন উক্ত মৌজার কৃষক প্রতিনিধি দল গত আশ্বিন মাসে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দরবার করিতে গিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এমতাবস্থায় চাষীরা যদি নিজেদের উদ্যোগে খাল কাটিয়া উক্ত মৌজার আবাদী অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা না করে তাহা হইলে অচিরেই ভীষণ দুর্দিন ঘনাইয়া আসিবে। সুতরাং উক্ত মৌজার হিন্দু-মুসলমান চাষীগণকে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের চাষীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই এখন অনাগত আকালকে নিশ্চিত ভাবে রুখিতে পারিবে।

(স্বাঃ) গোলাম [illegible]ন
চাষী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান

পড়া শেষ করিয়া সুনন্দা বলে, বাবা, কি সব বিচ্ছিরি কথাবার্তা—মৌজা, সেচ ব্যবস্থা, অমুক তমুক—একেবারে বস্তাপচা নথি-পত্তরের গন্ধ আসে নাকে। এই সব আবার লেখে নাকি কোনো ভদ্দরলোকে।

কালীচরণ ঈষৎ হাসিয়া বলে, তুমি তো আর লিখছো না, লিখছে চাষী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান।

—খাটিয়ে তো নিলে আমাকে দিয়েই।

—হ্যাঁ, তা নিলাম, আরও নেবো।

—ইস্ আর আমি লিখছি কি না এই সব।

—লিখো না : নির্লিপ্তভাবে ছিটের হাফসার্টটা গায়ে দিয়া কালীচরণ প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রগুলি একটা কাপড়ের থলিতে গুছাইয়া নেয়। বাহির হইয়া যাইবার সময় বলে, যাবার সময় তালাটা টিপে বন্ধ করে যেও সুনন্দা, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। উত্তরে সুনন্দা শুধু মাথাটা হেলাইয়া সায় দেয়। কালীচরণ পিছন ফিরিলে একটু পরে বলে, সারারাত জেগে কাজ করে দিলাম, একটা ধন্যবাদও দিলে না কালীদা!

যাচিয়াও ধন্যবাদ মিলিল না।

দেখিতে না দেখিতেই কালীচরণ সুনন্দার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

পোনেরো

দেখিতে না দেখিতে উঠানের রোদ সুপারি গাছের মাথায় গিয়া উঠিয়াছে। বেলা যায় যায়।

বুকের নিচে মাথার বালিশ দুইটা চাপিয়া মালিনী অভিনিবেশের সহিত শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পাঠ করিতেছিল! রেঙ্গুনের জাহাজ ছাড়িবার পূর্বেই হঠাৎ হন্তদন্ত হইয়া ঘরে ঢুকিল কালীচরণ। দূর হইতে মালিনীর গায়ের উপর একখানা চিঠি ছুঁড়িয়া দিয়া এক নিশ্বাসে বলিল, তোমার একখানা চিঠি। বোধ হয় কলকাতা থেকে, এই যে। হ্যাঁ, আর শোনো, যদি কেউ আমার খোঁজ করতে আসে তো এই কালীপদকে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়ে রেখে গেলাম, চট করে বনমালীর বাড়ি আমায় একটা খবর পাঠিয়ে দিও, কেমন?

মুখ তুলিয়া ছোট্ট দেহটাতে একটা দোল দিয়া মালিনী আলুথালু চুলগুলিকে পিঠের উপর সরাইয়া দেয়। অনর্থক প্রয়োজনে বুকের কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বিস্মিতের সুরে বলে, কি বললে! চিঠি! আমার!

সামান্য ঠিকানাটার উপর চোখ বুলাইতে গিয়া কালীচরণকে

আর দেখা যায় না। মুখ তুলিতেই মালিনী দেখে, কালীচরণ রসা কাঁটাল গাছতলা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কালীচরণের কাঁধের উপর অম্বিকাচরণের চকলেট রঙের পশমী আলোয়ানটা মাত্র এক মুহূর্তের জন্য মালিনীর নজরে পড়ে, তারপরই আর নাই। হাতের চিঠি হাতেই রহিয়া যায়। রঙ্গীন আলোয়ানের সুতা ধরিয়া মালিনীর মন কয়েকটা বছর পেছু হটিয়া আসে। ঘটনাবহুল অতীতের জীর্ণ ইতিবৃত্তের ভিতর দিয়া মালিনীর মনটা উইয়ের মতো কাটিয়া চলে। লাঠি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়ান বৃদ্ধ অম্বিকাচরণ। মালিনীর জীবনের একটা মূর্ত অভিসম্পাত। মালিনী দৃষ্টি সরাইয়া নেয়। আক্রোশে চোয়ালের হাড় দুইখানি তাহার যেন শক্ত হইয়া দুইদিকে চাপিয়া বসে। আসেন বংশলোচন—একটা স্বার্থপর ভীরু শ্বাপদের মতো। সামান্য টাকার লোভে যিনি তাহার নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রীকে একটা মুমূর্ষু স্থবিরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। মালিনীর মাথাটা কেমন যেন ঝিম-ঝিম করে। অভিমানে নাকটা লাল হইয়া ফুলিয়া কাঁপিয়া-কাঁপিয়া ওঠে। আর আসে পদ্মাবতী—গেরুয়াধারী খল ডাইনী। মিথ্যা আশার ভরসা দিয়া যে তাহার সর্বস্ব হরণ করিয়াছে। হঠাৎ একটা দমকা উত্তুরে বাতাসের ঠেলা লাগিয়া ঘরের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া যাইতেই মালিনীর চমক ভাঙ্গে। দেখে অন্যমনস্ক হেতু কনুয়ের চাপ লাগিয়া 'চরিত্রহীনে'র কতকগুলি পাতা বিশ্রীভাবে

মুড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। লাইব্রেরির বই, ছি, কালীচরণ আসিয়া কি বলিবে! বইয়ের পাতাগুলি তাড়াতাড়ি হাত দিয়া পাট করিয়া মালিনী খামের চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করে।

কলিকাতা

১০ই পৌষ, বুধবার

মণিমা,

বহুদিন হলো আপনার কোনো সংবাদ পাই নাই। ইতিপূর্বেও চিঠি লিখেছি কিন্তু উত্তর দেননি। হয়তো একেবারেই অনাবশ্যক মনে করেছেন। কি জানি! আমাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কারণ আমি অন্তত আপনার সহৃদয় মনোভাবটা একান্তভাবেই কামনা করেছিলাম আমার জীবনে।

দুর্গা অনেক সময় আপনার কথা বলে। একটিবারও এলেন না বলে দুঃখ করে। আমিই বারণ করি—বলি, দুঃখ করে কি হবে বলো! তিনি আমাদের ভুলে গেছেন। হয়তো সত্যি কথাই বলেছি।

আমরা নতুন বাড়িতে উঠে এসেছি। বাড়িটি খুব চমৎকার হয়েছে। একেবারে গঙ্গার ধারে। আপনি এলে খুবই খুশির কারণ ঘটতো। আসবেন জানালেই আমি মনিঅর্ডার যোগে আপনার নামে টাকা পাঠিয়ে দেবো। কবে আসচেন জানাবেন। পত্রপাঠ উত্তর দেবেন। ইতি—

গোবর্ধন

চিঠিখানি দুই তিনবার পড়িয়া মালিনী গোবর্ধনের অযাচিত আন্তরিকতায় একটু বিস্মিত, গর্বিত ও রুষ্ট হইল। রুষ্ট হইল এই আশঙ্কায় যে, সংসারে তাহার প্রতি অপর কাহারো টান ও ভরসার আশ্বাস কালীচরণের প্রতি তাহার ঐকান্তিক একাগ্রতাকে যে কোনো দুর্বল মুহূর্তে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। তবু মনে মনে মালিনী খুশি না হইয়া পারিল না। এই অভিমান ও আশ্বাসের কথাই বা তাহাকে আজ বলে কে! ভালো তো বাসেই! সংজামাই হইয়া কে আবার কার কত করিয়া থাকে! এই তো গোবর্ধন আজ আপনা হইতেই চিঠি লিখিয়া কত করিয়া তাহাকে কলিকাতায় যাইতে অনুরোধ-উপরোধ করিতেছে। কেন! সে তাহার এমন কি করিয়াছে যে, গোবর্ধনের নিকট হইতে সে এমন সহৃদয় ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারে। একান্ত আপনার জনের ব্যবহারগুলিও তো সে দুই চোখে চাহিয়া দেখিল এতদিন। মুখের কথাটাও তো কেহ জিজ্ঞাসা করিতে আসে নাই মালিনী বাঁচিয়া আছে না মরিয়া গিয়াছে। সে তুলনায় গোবর্ধন তো যথেষ্টই করে বলিতে হইবে। সংসারের ধারা আর তাহার বুঝিতে বাকি নাই।··· কত কথাই যে আপনমনে ভাবিয়া যায় মালিনী, তাহার ইয়ত্তা নাই। হঠাৎ পুষি বিড়ালটা ডাকিয়া উঠিতেই মালিনী সচকিত হয়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে কতক্ষণ, এখনো আলো জ্বালানো হয় নাই।

সে দিন অনেক রাতে কালীচরণ বাড়ি ফিরিল।

মালিনীর কাছে অবশ্য কালীচরণের এই অনেক রাতে বাড়ি ফেরাটা আদৌ অস্বাভাবিক নয়; কারণ এমন কালীচরণের বলিতে গেলে রোজই হয়। সকাল করিয়া ফিরিলেই বরং অঘটন একটা ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করার অবকাশ থাকে। সুতরাং ব্যাপারটা মালিনীর কাছে নূতন কিছুই নহে। তবে কোনোদিন হয়তো রাত সাড়ে দশটা কোনোদিন এগারোটা হয়—এই। সময়ের পরিমাপের সামান্য একটু হেরফের আর কি।

লণ্ঠনের আলোটা হঠাৎ জোরালো হইয়া উঠিতেই মালিনী একটু নড়িয়া-চড়িয়া শোয়। বলিতে কি, কালীচরণকে জানানি হিসাবে মালিনীর এই নড়িয়া-চড়িয়া শুইবার ভঙ্গীটাও একটা ছোটখাটো আইনে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ মালিনীর এই বিশিষ্ট শারীরিক প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত অনুসারেই কালীচরণ আবার তাহার ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করিবে। যেমন লণ্ঠনের আলো জোরালো হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মালিনী যদি একান্তই আঁড়মোড়া না ভাঙ্গে তো কালীচরণ মালিনীর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া নির্ঘাত পুঁথিপত্তর লইয়া বসিবে। এবং পরে এই খাওয়া লইয়া মালিনীকে নাকাল করিবে; আর আলো জ্বালিবার সঙ্গে সঙ্গেই মালিনী যদি নড়িয়া-চড়িয়া শোয় তো উত্তম কথা, কালীচরণ অন্য সব কাজ ফেলিয়া রাখিয়া আগে

ভাত খাইয়া লইয়া মালিনীকে রেহাই দিবে এবং কাগজপত্র যা হয় একটা কিছু লইয়া বসিবে। মোট কথা উভয়ের মধ্যে খোলাখুলি এ বিষয়ে একটা বোঝা-পড়া না হইলেও জিনিসটা একটা রেওয়াজে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

কালীচরণের হাত পা ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া আসা ও মালিনীর ভাত বাড়িয়া দিবার সময়ের মধ্যে কথা কিন্তু উভয়ের একরকম হয়ই না। গল্প শুরু হয় আরও পরে কালীচরণের খাওয়ার মাঝামাঝি। ডাল কিংবা বাজারদর প্রসঙ্গ হইতেই আলোচনাটা শুরু হইয়া একটা বিশিষ্ট খাতে চলিতে আরম্ভ করে। তারপর অনিবার্যভাবে ঠেকে আসিয়া সেই সামাজিক অচল অবস্থার বদ্ধ জলায়—যাহার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। আলোচ্য পথ লইয়া শেষ পর্যন্ত বিতর্কের অবসর থাকিলেও মতটা উভয়েরই একই থাকে।

তবে আজকের আলোচনার ধারাটা গোড়া হইতেই কেমন যেন একটু স্বতন্ত্র ধরনের—খাপছাড়া।

কালীচরণের সম্মুখে ভাত বাড়িয়া দিয়া মালিনী একটু হাসিয়া বলে, গোবর্ধন চিঠি লিখেছে।

কালীচরণের মাথায় সম্পূর্ণ অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাইতেছিল। মালিনীর কথা হয়তো সে শুনিতেহ পায় নাই। বলে, বিকেল বেলা কেউ আমার খোঁজ করতে আসেনি তো!

—কই না, কে আবার এলো!

—না তাই জিগগেস করছি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মালিনী আবার কথা পাড়ে, শুনলে না—গোবর্ধন, চিঠি লিখেছে !

—গোবর্ধন, লিখেছে !

হাঁটুতে গাল চাপিয়া মালিনী বলে, যেতে লিখেছে।

—তোমাকে ? বেশ তো যাও না। কিছুদিন থেকে এসোগে।

—তুমি যেতে বলছো ?

—হ্যাঁ, কেন যাবে না !

—না তাই বলছি, তুমি কি বলো !

—ও আমি, আমার আপত্তির কি থাকতে পারে। [illegible]র অনেক দিন হলো ওরা যেতেও বলছে তোমায় বার বার [illegible], যাও না। কালীচরণ হাসিয়া বলে, একে কলকাতার শহর [illegible] ওপর বেশ একটা শিক্ষিত পরিবেশ, মন্দ লাগবে না সেখানে তোমার, আমার মনে হয়।

—আমি তো আর শিক্ষিতা নই !

—কে, তুমি ! আরে গোবর্ধনের মতো একটা পণ্ডিত লোক, সেও কি না তোমার বাগ্মীতায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে, আর তুমি বলছ···

—থাক্ আর বলতে হবে না। জীবনে কিছুই শিখলাম না তার হবে কোত্থেকে !

—বাস্তবিক এমনিতেই তুমি যেরকম কথা বলো, লেখাপড়া

শিখলে তো য়্যাদ্দিনে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাধিয়ে বসতে।

মালিনী হাসিয়া বলে, তা ঠাট্টা করছো করো, কিন্তু চিঠির কি উত্তর লিখবো!

—উত্তর—লিখে দাও যে তোমার যেতে আপত্তি নেই, আবার কি। ভালো লাগে থাকবে, না লাগে কিছুদিন বাদে না হয় আবার চলে এসো।

—তা হলে এ সম্বন্ধে একদিন বসে সব ঠিকঠাক করতে হয়। যাওয়া বললেই তো আর যাওয়া হয় না।

—আবার ঠিকঠাক কি! তুমি তো এদিকে সব গোছগাছ করে রাখো তারপর আমিই যাই কি আর কেউ যায়, চট করে একদিন তোমায় অনায়াসে কলকাতায় রেখে আসা যাবে।

—তুমিই যাবে তো!

—ঠিক বলতে পারিনে, এই খালের হাঙ্গামাটা না মিটলে…

—এক্ষুনি আবার বেরুবে নাকি?—আচ্ছা, খাল কি জমিদার কিছুতেই কাটতে দেবে না বলছে।

—না।

—কেন!

—স্বার্থ।

—ওতে আর কি এমন স্বার্থ নষ্ট হবে জমিদারের!

—স্বার্থ এই যে বিলের থেকে খাল বের করে নিলেই এখন

বর্ষাকালে বিলের ডাক কম হবে—জমিদারের তাতে লোকসান। মাছের জন্যে ডাক হয় না বিলের বছর বছর।…তারপর চরের মাথাটা একটু ছাড়িয়ে দিলে এদিকে জমিদারের খাস ধান-জমিতে যদি জলের টান পড়ে তো তাতেও জমিদারের স্বার্থ নষ্ট হয়, এই সব আর কি।

—বারে, আর জলে বিলের ওদিককার চাষীদের জমির ধান যে প্রত্যেক বছরই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে বুঝি কোনো কথা হলো না।

—ঝগড়াটাই তো সেখানে। কালীচরণ সকড়ি হাত চাটিতে চাটিতে উঠিয়া পড়ে। বলে, এই সব হাঙ্গামার মধ্যে আমি থাকবো সারাক্ষণ ব্যস্ত। কখন আসি কখন যাই তার ঠিক নেই। এই সময়টা তুমি বরং কলকাতা গিয়ে যদি কিছু দিন থাকতে পারো তো ভালোই হয়। আর, একটা পরিবর্তনও হবে।

—তা হলে আমি এদিকে সব গুছিয়ে ফেলি।

—হ্যাঁ, সব ঠিক করে ফেলো।

—কি খুঁজছো, জল? ঐ তো ঘটিতে করে বারান্দায় রেখে এলুম এই মাত্তর। পেয়েছ?

—পেইছি?

—তো নাও, আজ তো আর বেরুনো নেই!

—হ্যাঁ, বেরুতে হচ্ছে একবার।

—এই অন্ধকার রাত। চারদিকে সাপখোপ শেয়াল, আজ আর নাই বা বেরুলে।

—ও আমরা সবাই এক গোত্তরের। মানুষের ভয়ে দিন-দুপুরে কি আর আমরা সব জায়গায় চলাফেরা করতে পারি!

মালিনী হতাশার সুরে বলে, কি যে এত কাজ কর! কাজ, কাজ আর কাজ। নাও, মশলা নাও।

বিছানার উপর হইতে আলোয়ানটা কাঁধের উপর ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় কালীচরণের নাকে আসে মালিনীর মাথার সুবাসিত নারিকেল তেলের মৃদু গন্ধ। আর মালিনী দেখি-দেখি বলিয়া কালীচরণের গালের উপর একটি দুষ্ট-ব্রণ দুই আঙ্গুলে টিপিয়া পূঁজ বাহির করিয়া দেয়।

ষোলো

কয়েকদিনের অবিরাম পথশ্রম আর অমানুষিক খাটুনির ফলে কালীচরণের দেহ একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। জ্বর গায়ে করিয়া অতিকম পাঁচটি মৌজায় সফর করার পর কলাকাঁদির ফেরি-ঘাটে একদিন বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিল; তারপর সাদেক সর্দারের কাঁধে ভর দিয়া কোনো মতে আজ বাড়ি আসিয়া উঠিয়াছে।

কালীচরণের অসুস্থতার জন্য সুনন্দা প্রথমটা একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু পরে আবার অন্তত কয়েকদিনের জন্য একান্তে পাইয়া খুশিই হইয়াছে। সামান্য ওষুধ ও বার্লি খাওয়াইয়া আসিতে পাঁচ মিনিটের জায়গায় কি করিয়া যে একটা বেলা কাটিয়া যায় চপলাসুন্দরী তাহা না বুঝিলেও সুনন্দা আসে কি করিয়া! নির্দিষ্ট সময়ে টেমপারেচার রেকর্ড করা, ঘড়ি দেখিয়া ঔষধ খাওয়ানো, রোগের সাধারণ লক্ষণগুলির প্রাত্যহিক হেরফের লক্ষ্য করিয়া পরদিন সকাল বেলা আবার মনি ডাক্তারের কাছে তাহার নির্ভুল ফিরিস্তি দেওয়া চপলাসুন্দরীর সাধ্যে নাই। লাহিড়ীর কথাই উঠে না; কারণ তাপমান

যন্ত্রের ভিতর তরল পারদের সূক্ষ্ম বিচরণ তাঁহার নজরেই আসে না।

সময়ে স্নান নাই, আহার নাই, অপরিসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত সুনন্দা কালীচরণের সেবায় নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছে। সাংসারিক কাজকর্মের ফাঁকে চপলাসুন্দরী নয় বড়জোর কালীচরণের উত্তপ্ত কপালের উপর তাঁহার ঠাণ্ডা হলুদ-বাটা হাতখানা স্পর্শ করিয়া বলিয়া যান, আজকে আর জ্বর বাড়বে না সুনি আমি বললুম। জ্বর তবু আসে।

সকালের দিকে কালীচরণের জ্বর কমিলে সুনন্দার আতঙ্ক বাড়ে। ভয় হয়, এখনই হয়তো সব কিছু তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া ঘাটে-মাঠে বাহির হইয়া পড়িবে। জ্বরবিকারের মধ্যেও যে নাকি খাল কাটার কথা বলে জ্বর ছাড়িয়া গেলে তাহার বিশ্বাস কি? বৈকালের দিকে কম্প দিয়া জ্বর আসিলে সুনন্দার সোয়াস্তি আসে। অন্তত সেদিনকার মতো তো সুনন্দা নিশ্চিন্ত। তাপ বৃদ্ধি পাইয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িলে সুনন্দা জ্বর দেখিবার ভান করিয়া কালীচরণের উত্তপ্ত কপালের উপর নিজের মুখখানা চাপিয়া ধরে; প্রায় পাংশু মুখখানাকে দুই আঁজলে ভরিয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিতে চায়। সুনন্দার মনে হয় যেন এই রকমই একটা দাহ তাহার অন্তঃস্থলে অহরহ হু হু করিয়া জ্বলিতেছে।

মাথায় জলপটি আর হাওয়া করিতে করিতে হাত ধরিয়া আসিলে

সুনন্দা কালীচরণের হাতের আঙ্গুলগুলি টানিয়া দেয়। তারপর মাথার বালিশটা যুত করিয়া দিয়া মিক্‌স্‌চার ঢালিয়া আনে।

—এই যে ওষুধ! ওষুধটা খেয়ে নাও।

—অ্যাঁ!

—ওষুধ।

—ওষুধ?

—হাঁ করো।

—করি। কিন্তু তুমি এখনও···

—হ্যাঁ, এখনও বসে আছি।

কালীচরণ আর কোনো উত্তর করে না।

কল ঘুরাইয়া দেয়াল-আলো কমাইয়া দিয়া সুনন্দা পাখা হাতে কালীচরণের শিয়রে গিয়া বসে। বাহিরটা নিঃঝুম, ভিতরটায় ঠোঁটে আঙ্গুল-ছোঁয়ানো ইঙ্গিত। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নাই। একটা আরসোলা শুধু কালীচরণের বার্লির বাটি চাটিয়া নিশঃব্দে গোঁফে তা দেয়। আর ঈষৎ আলোকে দেয়ালে প্রতিফলিত নিজ ছায়ামূর্তির দিকে আড়চোখে তাকাইয়া সুনন্দা ভাবে, তাহার ছোট্ট টিকালো নাকটার তুলনা হয় না।

রাত এখনো বেশি হয় নাই। কর্মকোলাহল মুখর শতনামপুরের প্রাণস্পন্দন এখনও মাটির বুকে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিয়া পড়িতেছে না। জনপদ এখনও জাগিয়া আছে—ঘুমায় নাই।

সুনন্দারও ঘুম নাই। অন্ধকার রাতে এমন একা একা জাগিয়া বসিয়া থাকিতে তাহার বেশ লাগে। সব কিছুই যেন সে নিবিড় করিয়া পায় এই আঁধারের মাঝখানে। সামান্য খুট্‌খাট্‌ টুক্‌টাক্‌ শব্দগুলিরও যেন একটা অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। দিবালোকে যে সমস্ত নিভৃত মর্ম-কথা অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্যের মাঝখানে তুচ্ছ মনে হয়, নিরালা অন্ধকারে মনের আর্শিতে সেগুলি যেন সব অতিকৃত হইয়া দেখা দেয়। হাঁড়ি-কলসী কুলা-ডালার আশপাশ দিয়া নেংটি ইন্দুরের ত্রস্ত আনাগোনা, উড়ন্ত তেলাপোকার ফরফরানি, চৌকাঠের মাথায় সম্বর হরিণের শাখায়িত শৃঙ্গে মাকড়সার নিঃশব্দ জালবোনা, দেয়ালের গায়ে তেরছা কালো কালো ছায়ার মিছিলে অন্তিমশয়নে বুড়ী ঠাকুমার চোয়াল বসা সাবেকী ফটো—কোনোটাই যেন এর এতটুকু তুচ্ছ করিবার নহে।

সুনন্দার মনের ঠিকানা নাই। নিঃসীম অন্ধকারের মাঝখানে দুই চোখ তারা-তারা করিয়া সুনন্দা শুধু ঠায় চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে।

সতেরো

ঘিওয়ের বিলের বুকে অস্তশেষ পশ্চিমাকাশের রক্তিম রূপোল্লাস তখনও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। দিনান্তে শতনাম-পুরের মাথায় মুঠা মুঠা সোনালী আশীষ বর্ষণ করিতে করিতে সূর্যদেব অস্তাচলে চলিলেন : শান্তি—শান্তি—শান্তি।

জ্বর বিরাম হইয়া গেলেও শরীরটা কালীচরণের তেমন ভালো যাইতেছে না। গলার স্বরটা এখনও দুর্বল, চলিতে ফিরিতে পা এখনও কাঁপে। চপলাসুন্দরী বলেন, এক নাগাড়ি শিশি-শিশি কুইনাইন খাইয়াই স্বাস্থ্যের এই হাল হইয়াছে; পূর্বের মতো আবার তেল-জল পড়িতে থাকিলেই দুই-চার দিনের মধ্যে শরীর ভালো হইয়া উঠিবে। লাহিড়ী বলেন, মাথা ধোও আর স্রেফ দুধ খাও, বিষক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

লাহিড়ী আবার কুইনাইনকে কুইনাইন বলেন না, বিষ বলিয়া অভিহিত করেন।

সুনন্দার বিধান আরও সহজ—শুধু বিশ্রাম। কয়দিন পরিপূর্ণ বিশ্রাম লইলে শারীরিক সমস্ত অসুস্থতা দূর হইয়া যাইবে। মণিডাক্তারই তো বলে—Rest is the best tonic.

কালীচরণ সম্ভবত প্রত্যেকের কথারই কিছুটা কিছুটা করিয়া পালন করিয়া যায়।

সন্ধ্যার পরই গুঁড়া-গুঁড়া হিম পড়িতে আরম্ভ করে। যাব কি যাব না করিতে করিতে আজও কালীচরণ বাড়ির বাহির হয় না। জলচৌকিখানা টানিয়া আনিয়া চণ্ডীমণ্ডপ ঘরের বারান্দায় আসিয়া বসে। চোখ বুলাইবে বলিয়া হাতে করিয়া একখানা বই আনিয়াছিল, কিন্তু মন বসিতে না বসিতেই উঠিয়া আসিল রাত্রি—আর পড়া হইল না।

ঘরে বাহিরে কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নাই। মালিনী কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে, বাঘা মরিয়া গিয়াছে, পুষি বিড়ালটাও আর দেখা যায় না। বাড়ির আনাচে-কানাচে কয়দিন কাঁদিয়া-কাটিয়া শেষ পর্যন্ত সেও হয় তো শতনামপুর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কেন যেন তাহার মনে হয়, এমনি করিয়া সকলেই একে একে শতনামপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। দুর্বল শরীর, শ্লথ স্নায়ু—কালীচরণের চোখ দুইটাও মমতায় ছলছল করিয়া ওঠে। বারান্দার উপর হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া কালীচরণ সামনের উঠানটায় গিয়া দাঁড়ায়। পায়ের নিচে তার শতনামপুরের ভিজে ঘাস খড় কুটা মাটির কোমল স্পর্শ, চলিতে গেলে কাটানটের গাছটা যেন পিছন হইতে তাহার কোঁচা টানিয়া ধরে—শতনামপুর ছাড়িয়া যাইয়ো না। তরল অন্ধকারে কালীচরণ উঠানের চারা আমগাছটার গায়ে হাত রাখিয়া ভর দিয়া দাঁড়ায়।

আপনমনেই অস্ফুটে করুণ হাসিয়া বলে, আমি যেতে যাব কেন! আমি যাব না।

সুনন্দা বোধ করি সন্ধ্যা-প্রদীপ দিতে আসিতেছিল; হঠাৎ অন্ধকারে কালীচরণের গলা শুনিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল।

—কে ওখানে!

—আমি।

—আমি; কে কালীদা?

—হুঁ।

—হিম পড়ছে, আর তুমি বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছো!

—ঘুরে আর বেড়াচ্ছি কোথায়। এই তো সবে একটু...

—কথা কইছিলে কার সঙ্গে!

—কথা কইছিলাম!

—হ্যাঁ, কোথায় কি যাবে না, না কি করবে বলছিলে যেন!

—অ, ও কিছু না।

সুনন্দা আর কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে না। করিয়া লাভ কি? কথা তো কতই বলিবার আছে। কিন্তু শুনিবার লোক কোথায়! সংসারে মানুষ সব হয় দেবতা—নয় দানব হইয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষের সাধারণ কথাবার্তা যেন কাহারো কানে পৌঁছায় না। লণ্ঠন জ্বালাইয়া দিয়া সুনন্দা ত্রস্ত পায়ে চণ্ডীমণ্ডপ ঘরের বাহির হইয়া যায়।

হঠাৎ কি একটা যেন দরকারী কথা আছে মনে করিয়া

কালীচরণ পিছন হইতে বলিয়া ওঠে, সুনন্দা চলে যাচ্ছো! সুনন্দা!

লঘু পায়ে ফিরিয়া আসে সুনন্দা। হাসিয়া বলে, পেছন থেকে ডাকলে তো!

—কেন, ডাকতে নেই, তাই!

সুনন্দা মাথা নাড়িয়া সায় দেয়।

কালীচরণ হাসিয়া বলে, আছে নাকি আবার তোমার এ সবও।

সুনন্দা ধপ করিয়া বেতের চেয়ারটায় বসিয়া বলে, অবস্থা বিশেষে।

—কি রকম।

—কি রকম মানে···বলবো বলছো!

—হ্যাঁ, বলবে বৈকি।

—ভয়ে না নির্ভয়ে—

—আচ্ছা নির্ভয়েই বলো।

সুনন্দা দুষ্টামি করিয়া বলে, মানে এই যেমন ধরো আমার এখন তোমার সঙ্গে দুদণ্ড বসে গল্প করতে ইচ্ছে করছে অথচ— জানি না এখন সত্যি কি মিথ্যে—তোমার আদৌ ইচ্ছে নেই যে আমায় তুমি ডেকে বসাও। হঠাৎ হয়তো কি কারণে তুমি পিছন থেকে ডেকে ফেলেছো, আমি এখন তার সুযোগ নিচ্ছি। সুনন্দা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলে, বুঝতে পারলে!···

—খানিকটা—

—বাস্তবিক আমি কি চালাক। স্বীকার করো।

—তা করছি, কিন্তু আমার ইচ্ছে-টিচ্ছেগুলোর এই ধরনের অপব্যাখ্যা করাটা কিন্তু তোমার ভারী অন্যায় সুনন্দা।

—অপব্যাখ্যা নিশ্চই অন্যায়।

—মানে ?

—মানে আমি তোমার কথাই তো সমর্থন করছি—অপব্যাখ্যা খারাপ, একবার ছেড়ে একশোবার।

—অর্থাৎ বলতে চাও যে এ ক্ষেত্রে তুমি ঠিকই ব্যাখ্যা করেছো।

—ভুল ব্যাখ্যা আমি সচরাচর করি না বলেই তো আমার বিশ্বাস। আর···

—আচ্ছা শোন, সুনন্দা শোন।

—বলো।

—তুমি আমাকে কতটা নিষ্ঠুর, মানে কাঠখোট্টা অভদ্দর লোক বলে মনে করো বলতো !

—তা তোমার ভাষায় যতটা নিষ্ঠুর মানে কাঠখোট্টা অভদ্দর লোক তুমি হতে পারো, ঠিক ততটা।

কালীচরণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, বেশ তো তর্ক করতে পারো তুমি।

সুনন্দা হাসিয়া বলে, হেরে তো গেলে শেষ পর্যন্ত। চেয়ারটা প্রদক্ষিণ করিয়া বলে, যা হোক কাজের কথা বলি, তোমার

খাবারটা কি এখনই এখানে এনে দেবো, না পরে গিয়ে খাবে ?

…যা খুশি।

কালীচরণ ইতস্তত করিয়া বলে, একটু পরে খেলে আপত্তি আছে।

—না, বললুম যে, যা খুশি। তবে বেশি রাত না করে সকাল সকাল তোমার খেয়ে নেওয়া উচিত।

—উচিত বলছো ? আচ্ছা, আনো।

সুনন্দা খুশি হইয়া খাবার আনিতে যাইবার পথে চৌকাঠের কাছে থমকাইয়া দাঁড়ায়। দেখে দুই-তিনজন লোক জটলা করিতে করিতে তাড়াতাড়ি চণ্ডীমণ্ডপ-ঘরের দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

সচকিত হইয়া বলে, কারা যেন আসছে কালীদা তোমার কাছে। আমার এখানে! কালীচরণ উৎকর্ণ হইয়া বলে, গোলাম হোসেনের গলা শুনতে পাচ্ছি যেন, কি ব্যাপার! আচ্ছা, তুমি তা হলে যাও সুনন্দা এখন, খাবারটা না হয় পরেই দিও। সুনন্দা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া খুট করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ-ঘরের বাহির হইয়া যায়।

দূরের জটলা যেন অন্ধকারে গড়াইতে গড়াইতে নিকটতর হইয়া আসে। কালীচরণ বারান্দায় গিয়া দাঁড়ায়।

—কে গোলাম হোসেন !

—গোলাম হোসেন।

—সঙ্গে কে?

—ভোলাই মণ্ডল।

সঙ্গে সঙ্গে ভোলাই মণ্ডলেরও গলা শোনা যায়: সঙ্গে জাবালেও আছে।

—কি ব্যাপার!

—ব্যাপার এট্টু গুরুতরই।

—এস, ভেতরে এস

গোলাম হোসেন, জাবালি বাগদি ও ভোলাই মণ্ডল কালীচরণের অনুসরণ করে।

সুনন্দা বাহির হইতে জানালায় উঁকি মারিয়া দেখে, কাপড়ে কান-মুখ-মাথা ঢাকা বড় বড় তিন জন লোক যেন মটকা হইতে মেজে পর্যন্ত মণ্ডপ-ঘরের সবটুকু স্থান জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনটি লোকের সঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে হ্যারিকেন লণ্ঠনের নিষ্কম্প শিখাটি যেন ত্রাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। তিনজনই উদ্বিগ্ন—ক্লান্ত বিশেষ করিয়া ভোলাই মণ্ডল। পথশ্রমের শ্রান্তি তখনও তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতেছে।

কালীচরণ ভোলাই মণ্ডলকে লক্ষ্য করিয়া বলে, বসো মণ্ডল!

উৎকণ্ঠিত গোলাম হোসেন নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলে, বসে কথা কও।

জাবালি বাগদি বলিবার অপেক্ষা রাখে নাই। ছোট জলচৌকি-খানার উপরে নলচিতার মতো হাত পা গুটাইয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিয়াছে।

ভোলাই মণ্ডল ঢোক গিলিয়া বলে, খাল পাড়ে কোদাল পড়েছে তো আজ রাত থাকতেই! সকাল বেলা বড় ছেলে জিজ্ঞিরেরে বললাম, বলি তুই তারে হাত লাগাগে ততক্ষণ, আমি চর-কাস্থুন্দিপুরটা ঘুরে আসি খপ করে। চর-কাস্থুন্দিপুর আমার এট্টু প্রয়োজন ছিল।

জাবালি বলে, প্রয়োজনটা আবার কি ছিল তা খুলে বলো।

গোলাম হোসেন মাথা নাড়ে।

কালীচরণ নড়িয়া-চড়িয়া উৎকর্ণ হইয়া বসে।

ভোলাই মণ্ডল বলিয়া যায়, প্রয়োজনটা এই যে চর-কাস্থুন্দিপুর তো হলো গিয়ে আমার শ্বশুরবাড়ি। তাই ভাবলাম বলি হাতেম আর তাহের মিঞাকে ধরে করে বেলাবেলি যদি আরও খান পঞ্চাশেক কোদাল এনে ফেলতে পারি তো কাজটা পাঁচ হাতে চড়চড় করে এগিয়ে যাবেখন!

কালীচরণ বলে, হাতেম আর তাহের মিঞা হলো গিয়ে তোমার …কালীচরণের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ভোলাই মণ্ডল বলে, আমার সম্বন্ধী।

—আচ্ছা।

ভোলাই মণ্ডল বলিয়া যায়, হ্যাঁ, তা হাতেম আর তাহের মিঞার কাছে ব্যাপারডাও খুলে বুঝিয়ে বলতেই তারা বললে যে, হ্যাঁ যাব, নিচ্চয় যাব। সঙ্গে সঙ্গে গেরামের আর পাঁচজনারে ডেকে তারা পরামর্শও করলে এ বিষয়ে। নিজেদের মধ্যে

কওয়া-বলার পর আসবার সময় আমারে কথা দিলে যে এই বিকেল বেলা নাগাদ চর-কাসুন্দিপুর অন্তত জনা তিরিশেক লোক এখানে এসে খালে কাজে নামবে। কোদাল তারা সব সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। তা এই কথাবার্তা একেবারে পাকাপাকি করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা দেখি একেবারে হেলে গেছে। পথে আসতে আসতে ভাবলাম বলি, যাই একবার দেখে যাই কতডা কি হলো না হলো।

কালীচরণ বলে, খালের দিকে যাবার মন করলে আর কি!

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—তারপর একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে আমি তো এগুচ্ছি, পথে দেখা নারানদার সঙ্গে। বললে, খবর শুনেছো। এমন করে কথাটা বললে যে, আমি এট্টু আশ্চর্যই হলাম। বললাম, না জানিনে তো। কেন হয়েছে কি! এই বলতে না বলতেই দেখি নমশূদ্দুর পাড়ার প্রাণকান্ত সরকারের ভাই রতিকান্ত রেল লাইন পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে আমাদের দিকেই আসছে। কি ব্যাপার! খানিকটা এগিয়ে গেলাম। যেয়ে দেখি, সে তোমারে আর বলব কি, রতিকান্তর কাপড়-চোপড় সব রক্তে একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছে। জিগগেস না করতেই বললে, মণ্ডলদা, শিগগির যাও, ভাইরে আমার ওরা মেরে ফেললে। বললাম, বলি তা হয়েছে কি ভালো করে বল! তা শুধু কি রকম

পানা করে, কথা কয় না। হাঁটুতে পরে দেখলাম রতিকান্তও খুব জখম হয়েছে। বেচারা দাঁড়াতে পারছিল না। তাড়াতাড়ি আমার কাঁধের উপর ওর একটা হাত পেঁচিয়ে নিয়ে কোনোমতে দাঁড় করলাম। বললে, ঘিওরের বিলে গুলি চলেছে মণ্ডল, আমারে ছেড়ে দে তুমি খাল মুখো যাও! কি করি, নারানদারে বললাম, বলি তুমি যেমন করে পারো রতিকান্তরে কোনোমতে হাটখোলার মণিডাক্তারের ওখানে নিয়ে যাও, আমি চললাম ঘিওরের বিলে। ওরে দাদারে, বলে রতিকান্ত তো সে তোমার রাস্তার ধারে আসশ্যাওড়া বনে লুটিয়ে পড়ল। আমি আর কি করব! ঐভাবেই নারানদার কাছে ওর জিম্মা করে দিয়ে আমি ছুটলাম ঘিওরের খালের দিকে। এই সন্ধ্যে তখন তোমার হব হব করছে আর কি! ছুট ছুট! ফেরি ঘাটের কাছে এসে দেখি সে একেবারে ভয়ানক গণ্ডগোল বেধে গেছে; এপার ওপার প্রায় জনা পঞ্চাশেক লোক জটলা করছে। মুশকিলেই পড়লাম। এখন যাই কোন দিক দিয়ে। একবার দেখলেই তো জান নিয়ে নেবে। করলাম কি, বিশ ত্রিশ হাত পশ্চিমে ঐ গে তোমার অক্ষয় সাউর পাটের গুদোমের ধার ঘেঁষে একেবারে খালে নেমে পড়লাম। জল যেন সে একেবারে কেটে বসতে লাগলো গায়-গতোরে। উপায় নেই। ডুব-সাঁতার কেটে একেবারে গিয়ে উঠলাম ওপার। এখন অন্ধকারে কোনো কিছু ভালো ঠাহরও করতে পারিনে। তবু যেতে তো হবেই, চললাম।

তারপর একটু এগুতেই দেখি নমশূদ্দুর পাড়ার সতীশ শিকদার খালের পাড়ে প্রাণকান্তর লাস আগলে নিয়ে বসে আছে। মারামারি তখন প্রায় তোমার শেষ হয়ে এয়েছে। ওদের পক্ষে বন্দুক ছিল তাই এরা আর এগুতে সাহস করেনি। কি করি। শিকদারকে বললাম, বলি মিছে আর এইরকম লাস আগলে ব'সে থেকে করবা কি, যাও সময় থাকতে সরে পড়। আশেপাশে দু-চারজন য্যারা ছিল তাদেরও সব সরে পড়তে বললাম। খামাকা ওখানে থেকে আর কি হবে!

আমি আর গাঁয়ে ফিরলাম না। খাল পার হয়ে একেবারে হাঁটাপথ ধরলাম। পথে শোনলাম চৌধুরিদের আটচালা কাছারি-বাড়িতে নাকি আগুন লেগেছে! আমি তখন প্রায় মাথাভাঙ্গা ধরো-ধরো করছি। চারদিকে মাঠ আর মাঠ। একখানার পর আর একখানা শুধু পার হয়েই চলেছি। একবার শুধু পেছন ফিরে চেয়ে দেখলাম পূবদিকের আকাশটা একেবারে লালে লাল হয়ে গেছে।

গোলাম হোসেন এতক্ষণ চুপ করিয়া মণ্ডলের মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। ভোলাই মণ্ডলের বক্তব্য শেষ হইলে ঘামে ভেজা কপালের উপর হাতের দোলাইখানা একবার বুলাইয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসে।

কালীচরণ নিরুত্তর।

জাবালি বাগদি কি একটা কথা বলি-বলি করিয়াও বলিল না।

পায়ের পাতার উপরে সশব্দে একটা মশা চাপড়াইয়া মারিয়া বাহিরে ঝুলকালো অন্ধকারের মধ্যে তাকাইয়া রহিল। ঘটনা যেন সমস্ত বলাবলির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; করিবার আছে এখন শুধু কাজ। যে কাজের কথা অন্তত আজ বাদে কাল শতনামপুরের শিশুরা ঠাকুমাদের কোলে বসিয়া ভয়ে ভয়ে শুনিবে—জাবালি বাগদির গল্প।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ভোলাই মণ্ডল হতাশার সুরে বলে, তা এই তো শুনলে ব্যাপার এখন···

কালীচরণ ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়ায়। গোলাম হোসেনকে লক্ষ্য করিয়া বলে, সকলে মিলে এই রকম এক গাট্টা হয়ে বসে না থেকে ভোলাই আর জাবালি বরং বাড়ির দিকে যেয়ে সব খবরা-খবর করুক, আমরা এদিকে সিকদার পাড়া হয়ে ঘুরে যাই।

গোলাম হোসেন কালীচরণের কথায় সায় দিয়া জাবালি বাগদিকে বলে, চলে যাও তা হলে তোমরা দুজনে, খবরাখবর করগে সব। আর অনর্থক সোরগোল যেন না হয়—এই নিয়ে, দেখো।

ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া জাবালি বাগদি বলে, না সোরগোল হতে যাবে কেন! সোরগোলের কি আছে।

পিছন হইতে গোলাম হোসেন আবার ভোলাই মণ্ডলকে সমঝাইয়া দেয়, জিঞ্জিরেরে আগলে রেখো মণ্ডল, মিছে হৈ চৈ যেন না বাধায়।

ভোলাই মণ্ডল আর জাবালি বাগদিকে রওনা করিয়া দিয়া কালীচরণ ও গোলাম হোসেন সিকদার পাড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

চণ্ডীমণ্ডপ ঘরের দরজা ভেজানো দেখিয়া সুনন্দা ভাবিয়াছিল, হয়তো চলিয়া গিয়াছে সকলে এতক্ষণে। হঠাৎ কালীচরণ ও গোলাম হোসেনকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া উঠানের মাঝখানে খাবারের থালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। অস্ফুটে বলে, তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ কালীদা!

পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই কালীচরণ দেখে সুনন্দাকে—খাবারের থালা হাতে করিয়া অন্ধকারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটু আগাইয়া গিয়া বলে, বড্ড জরুরি সুনন্দা, কোনো কারণে আমাকে এখুনি বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। তোমাকে পরে বলবো সব।

সুনন্দা উৎকণ্ঠিতের সুরে বলে, কিন্তু এই অসুখ শরীরে এত রাত্তির করে তুমি বেরিয়ে যাচ্ছো! খেয়েও গেলে না দুটো কালীদা!

বাধা দিয়া কালীচরণ সুনন্দাকে ঈষৎ অনুনয় করিয়া বলে, পেছন থেকে ডাকা সত্বেও বসে যেতে পারলাম না দেখছো।

—ইস্, তুমি আবার ওসব মানো কি না!

কালীচরণ ত্রস্তে পিছন ফিরিয়া হালকা গলায় বলে, মানি—অবস্থা বিশেষে।

হাসিতে গিয়া কান্না আসে সুনন্দার ; কোনো কথা বলিতে পারে না।

দুইটি ছায়ামূর্তি দেখিতে না দেখিতে নিঃসীম অন্ধকারে মিলাইয়া যায়।

আঠারো

ঘটনার দুই দিন পর—সকাল বেলা।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পূর্বেকার রাত্রির যবনিকা যেন এই মাত্র উঠিল। পথ ঘাট এখনও নির্জন—শতনামপুরের রাস্তায় এখন ভালো করিয়া লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই। কি জানি, কখন কি ঘটিয়া যায়।

বেলা বাড়িয়া সূর্য উঠিয়াছে বাঁশঝাড়ের মাথার উপর। আসশ্যাওড়া আর বৈঁচির ডালে বুলবুলি পাখির ত্রস্ত লঘু আনাগোনা কমিয়া আসিয়াছে। ঘরমোনাই পাখির গান এখন আর শোনা যায় না। দূরে দেখা যায় ঘিওরের বিল, সূর্য কিরণে একখানা কসাই-এর ছুরির মতোই ঝক্ ঝক্ করিতেছে। বিলের দুইধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, চক্রবাল রেখার সহিত গিয়া মিশিয়াছে। বিলের মাঝখানে উঁচু একটা মাটির ঢিপি, দেখিতে অনেকটা ছোট্ট একটা দ্বীপের মতো, নলখাগড়া আর আগাছায় ভরিয়া দিয়াছে। ঘন সন্নিবিষ্ট খাগড়াবনের মাঝে দৃষ্টি চলে না—এমনই জাঁতার। লোকে বলে কোনো কোনোদিন রাত্রে এই নলখাগড়া বনে নাকি দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলে;

আর থাকিয়া থাকিয়া একটা নারীকণ্ঠ আর্তনাদ করিয়া ওঠে, মলাম গো, গেলাম গো, বাঁচাও গো···। কিংবদন্তী আছে বহুদিন আগে এক ডাইনী বুড়ী নাকি এইখানে ঘরে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া মরিয়াছিল। জায়গাটা খারাপ তাই লোকে বড় একটা আসে না এই অঞ্চলে।

এইখানেই আবিষ্কার করা গিয়াছে শৈলপতিবাবুর লাস—চর-কাসুন্দি মৌজার দুর্ধর্ষ নায়েবের মুখে শিস্ সমেত পাকা ধান ঠাসিয়া মুগুরের ঘায়ে জীবনান্ত করিয়া যায় যেন কে বা কাহারা! প্রকৃত আসামীর সন্ধান এখনও পাওয়া যায় না; তবে সন্দেহ-ক্রমে পুলিশ মাত্র কয়েকজনকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। কালো কালো চেহারার তিন চার হাত পরিমাপের সহজ মানুষগুলি সব মেষের মতো ঠাণ্ডা স্বভাবের। বাছুরের মতো নাটা নাটা চোখ করিয়া ভয়ার্ত মুখে শুধু দারোগা বাবুর মুখের দিকে চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকে আর কাঁদে। ভালো মুখে জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, কিছুই জানে না তারা এই হত্যাকাণ্ডের। আবার দোষ স্বীকারান্তে লঘু শাস্তির আশ্বাসে সকলেই বলে—প্রত্যেকেই খুন করিয়াছে চর-কাসুন্দি মৌজার নায়েবকে। দরোগাবাবু হাসেন। মুশকিলেরই কথা বটে। এ দলকে ছাড়িয়া দিয়া অন্যদলকে ধরিয়া আনা হয়; কিন্তু সকলের মুখেই ঐ এক কথা। সারা মৌজায় জোর তদন্ত অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকে। জমিদার অনন্ত চৌধুরির শাসন-তান্ত্রিক মোগলাই

মেজাজ ছত্রভঙ্গ। ভোজপুরী দারোয়ানের বেপরোয়া লাঠি শৈলপতি বাবুর আততায়ীর হদিস দিতে পারে নাই।

সোঁটা সোঁটা কালো দাগ পিঠে করিয়া শতনামপুর ও চর-কাসুন্দি মৌজার যে সমস্ত নিরপরাধ অধিবাসী হাজতে চলিয়া গিয়াছে আজ তাহার প্রতিবাদ দিবস।

সকাল হইতেই ঘিওরের বিলের চরে জনসমাগম আরম্ভ হইয়াছে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের সীমান্ত রেখা ভাঙ্গিয়া কাতারে কাতারে মানুষ বিরাট জনসমুদ্রে পড়িয়া একাকার হইয়া যাইতেছে। সুদূর দক্ষিণাঞ্চল হইতে চাষী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের ঝাণ্ডা হাতে আসিতেছে অগণিত কিষাণ। মাথাভাঙ্গা, কদমগাছি ও আরামগঞ্জের চাষীরা পশ্চিমদিকের আল বরাবর কাতার দিয়া আগাইয়া আসিতেছে। মাটির উপর শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মানুষের ন্যায়নিষ্ঠ অধিকার হাজার কণ্ঠে ফাটিয়া পড়িতেছে: লাঙ্গল যার জমি তার, পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক। উত্তরের কালো মাটি চিরিয়া—পীরপুর, রত্নখালি ও বরাটনগরের চাষীরা দলে দলে চরের বুকে নামিয়া আসিতেছে। খর রৌদ্রে ঘামে ভেজা কালো কালো চওড়া পিঠগুলি তাহাদের ঢালের মতো ঝকঝক করিতেছে।

যতদূর দৃষ্টি চলে দেখা যায় শুধু শ্রেণীবদ্ধ মানুষের মিছিল—সমগ্র জনপদ যেন প্রান্তরে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

সভা আরম্ভ হইলে বালিয়াড়ির উপর উঠিয়া দাঁড়ায় কালীচরণ,

বিপর্যস্ত জনপদের অবিসংবাদী বন্ধু। বলে : ভাইসব, সামান্য কয়েক ঘণ্টার নোটিশে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে আপনারা যে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সে কারণে সমিতির তরফ থেকে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অবস্থার গুরুত্বটা যে আপনারা সকলেই ধরতে পেরেছেন এটা খুবই সুখের বিষয়।

ইতিপূর্বে সূজা নদীর খাল কাটা সম্পর্কে সমিতি লিখিতভাবে যে নির্দেশ দেয়, তা আপনারা সকলেই প্রত্যেক মহলে পেয়ে থাকবেন। সমিতির এই সিদ্ধান্ত চাষীমহলের সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত।

এখন, এই যে সিদ্ধান্ত, এটা কোনো সাময়িক উত্তেজনার বশে করা হয়নি। বছরের পর বছর, এ শুধু এক সনের কথা নয়, বহুতর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করবার পর, শেষ পর্যন্ত একরকম নিরুপায় হয়েই আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সুতরাং দুটো কড়া কথা আর দু ঘা লাঠির বাড়ি মেরে শুরুতেই আমাদের কাজ বানচাল করে দেওয়ার যে একটা চেষ্টা চলছে, এ আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করবো না।

সমস্বরে ধ্বনি ওঠে, কিছুতেই না!

দারোগা নগেন সেন পাশেই একটা টিনের চেয়ারে বসিয়াছিল। চীৎকার শুনিয়া লাফাইয়া উঠিল : This is incitement, I should say.

কালীচরণ বলিয়া যায়; অবিশ্যি লাঠালাঠি করা আমাদের কাজ নয়; সে উদ্দেশ্যও আমাদের নেই। চর-কাসুন্দি মৌজার নায়েব শৈলপতি ঘোষের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগত শত্রুতার দরুন কেউ হয়তো এ-কাজ করে থাকবে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে খাল কাটার বিষয়টা জড়িয়ে অনন্ত চৌধুরি আমাদের সমিতির লোকজনের ওপর খামখা যে অন্যায় অত্যাচার করছে এবং নানা ফিকির ফন্দি করে আজ খাল কাটার কাজ পণ্ড করে…

নগেন সেন বাধা দিয়া দিয়া বলে, আপনি শান্তি ভঙ্গ করছেন।

কালীচরণ বলিয়া যায়: ভাই সব, এ খাল আজ যে করেই হোক আমাদের কাটতেই হবে; কারণ এই দুর্বৎসরেও যদি আমাদের জমির ফসল জল অভাবে নষ্ট হয়ে যায় তা হলে কলাকোপা মহকুমার চাষীদের বাঁচবার এবার আর কোনো উপায় থাকবে না। সুতরাং অনন্ত চৌধুরিই হোক আর যেই হোক…

নগেন সেনের ইঙ্গিতে গোটা তিনেক লাল পাগড়ি বালিয়াড়ির উপর লাফাইয়া ওঠে।

কালীচরণ বলিয়া যায়, এ খাল কাটা আমাদের কেউ বন্ধ করতে পারবে না। আজকের দিনে মৃত শহিদ প্রাণকান্তর কথা স্মরণ করে…

পিছন দিক হইতে একখানা বলিষ্ঠ হাত কালীচরণের ঘাড়টাকে যেন মটকাইয়া ভাঙ্গিয়া দিতে চায় : চুপ যা গিদ্ধোড় !

নগেন সেন কালীচরণের দিকে তাকাইয়া একটু করুণ হাসিয়া বলে, বারণ করলুম স্যার আপনাকে কিছু বলতে, তা আপনি কিছুতেই শুনবেন না !

জনসমুদ্র পদ্মার মতোই উপরে অনুত্তাল নিস্তরঙ্গ কিন্তু গভীরে আবর্তসঙ্কুল—ক্ষুরধার।

একটু পরেই উঠিয়া দাঁড়ায় গোলাম হোসেন—মাঠের রাজা। দীর্ঘ ঋজু কাঠামোটা বয়সের চাপে একটু বাঁকিয়া গিয়াছে। কালীচরণের কথার জের টানিয়া বজ্রকণ্ঠে বলিষ্ঠ ঘোষণা করে : প্রাণকান্তর কথা স্মরণ ক'রে আমরা শুধু এই সংকল্পই গ্রহণ করবো যে, যে-সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিতে গিয়ে প্রাণকান্ত তার জীবন দিয়ে গেল, আমরা যেন তার এতটুকু অমর্যাদা না করি। আমার নওজোয়ান ভাইরা সব...

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। বিষণ্ণ বৈকালের আকাশে এক ঝাঁক বালিহাঁসের পাখার সাঁই সাঁই শব্দ আস্তে আস্তে মিলাইয়া যায়। অস্তশেষ পশ্চিমের সোনালী আলোর প্লাবন স্তিমিত হইয়া আসে। সঙ্গীহারা একটা বাদুড় খালের বাঁক ধরিয়া লাট খাইতে খাইতে লোকালয়ের দিকে উড়িয়া চলে। বিস্তীর্ণ চরের বুকে ধীরে ধীরে নামিয়া আসে ধূসর গোধূলির ক্লান্ত স্বর্ণচ্ছায়া।

শপথ গ্রহণের পর সভা ভঙ্গ হয়। ছত্রভঙ্গ জনতা দেখিতে

দেখিতে টুকরা মেঘের মতো সারা মাঠের বুকে ছড়াইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন ধ্বনি করিতে করিতে নিজ নিজ জনপদের দিকে অগ্রসর হয়। চলার ভঙ্গীটা আজ যেন ওদের আরও তির্যক। মনে হয় কোনো একটা জরুরি প্রত্যাদেশের আজ যেন ওরা বিশেষ বার্তাবহ।

উনিশ

সাতাত্তরের দুই নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের বৈচিত্র্যহীন পরিবেশের মধ্যে মালিনীর জীবন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। আগে মনে করিয়াছিল অনেক কথাই। ভাবিয়াছিল হাতি ঘোড়া কত কি-ই না দেখা যাইবে এই আজব শহরে; এখন দেখে একেবারেই ভুয়া। স্রেফ ইট কাঠের ভোঁতা সমারোহ। এর চেয়ে শতনামপুর শতগুণে শ্রেষ্ঠ। মনের খুশিতে যত ইচ্ছা হাসো খেলো বেড়াও, কেহ কোনো কথা বলিতে আসিবে না। আর এখানে শরীর ও মনের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি যেন চার দেওয়ালের গণ্ডীর বাহিরে একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শুইয়া সুখ নাই, বসিয়া সুখ নাই, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা লৌকতা-ভব্যতার সতর্ক আঙুল যেন সর্বদাই 'এটা করিতে নাই' 'ওটা বলিতে নাই' বলিয়া নিঃশব্দে ইঙ্গিতে শাসাইতেছে। ব্যবহারে মেলে না, কথায় মেলে না, কলতলার ধেড়ে ইঁদুরগুলি পর্যন্ত কি রকম সপ্রতিভ ভাবে মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

মালিনীর আর কলিকাতায় থাকিবার ইচ্ছা নাই।

থাকা উচিতও নয়। কারণ এই গোবর্ধনের সংসারেও মালিনীর

বিরুদ্ধে কোথায় যেন একটা নালিশ জমিয়া উঠিয়াছে। পূর্বের মতো এখন যেন আর সে ঠিক বাঞ্ছিত নয় এ বাড়িতে। বিশেষ করিয়া দুর্গা, শত আত্মীয়তার মধ্যেও ঐ যে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব, মালিনী একেবারেই সহ্য করিতে পারে না। আর গোবর্ধন, আচরণে সেরূপ কোনো ভাব ব্যক্ত না করিলেও অস্বস্তি যে ঠিক কোথাও না কোথাও একটা অনুভব করে—এটা মালিনী বুঝিতে পারে। হয়তো পছন্দ করে বলিয়াই এই অস্বস্তি, কে বলিবে!

আজ রবিবার—মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামে সাময়িক বিরতি। মালিনী দোতলার খোলা বারান্দায় বসিয়া আপনমনে কুটনো কুটিতেছিল। এমন সময় গোবর্ধন আসিয়া রেলিংএ ভর দিয়া দাঁড়াইল। গোবর্ধনের আত্মীয়তা স্বীকারের এই সবিনয় ভঙ্গীটা মালিনীর মন্দ লাগে না। [illegible] বৈঠকখানার কাজকর্ম তুচ্ছ করিয়া নগণ্য এই স্থ[illegible]তে দাঁড়ায়। কালহরণের কথাটা গোবর্ধন সম্পর্কে ঠিক ভাবা যায় না।

মালিনী শশব্যস্তে একখানা আসন পাতিয়া দিয়া বলে, দাঁড়িয়ে কেন, বসলেই হয়।

শালের মুড়াটা কাঁধের উপর তুলিয়া গোবর্ধন হাসিয়া বলে, বসবো বা কি, মনটা খারাপ হয়ে গেল।

—কেন!

-কেন কি, শুনলুম আপনি নাকি এর মধ্যেই যাব-যাব করছেন!

মালিনী কোনো কথা কয় না। থোড় কুচাইয়া ডান হাতের তর্জনীতে আঁশ জড়াইতে জড়াইতে একটু হাসে।

গোবর্ধন বলে, কি, হাসছেন যে! কলকাতা আর ভালো লাগছে না নাকি!

—না, ভালো লাগবে না কেন!

তবে?

—হলোও তো অনেক দিন, এইবার যাই—আবার না হয়...

গোবর্ধন হাসিয়া বলে, হ্যাঁ, সে আবার যে আপনি আসচেন চট করে, সে আশা...

—না তো, আসবো না কেন।

—আমিও তো সেই কথাই ভাবি, কিন্তু...

গোটাকয়েক ডাই-পিঁপড়েকে যাত্রী করিয়া এক গামলা জলে বাবলু মোচার খোলার ষ্টিমার ছাড়িতেছিল। মালিনীর শতনামপুর যাইবার কথা শুনিয়া চেঁচাইয়া বলে, যাবে তো উঠে পড়ো দিমমা, এইবার ষ্টিমার ছাড়বে।

মালিনী বাবলুকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, বাবলুই বলে আমাকে আর দুদিন বাদে নিয়ে আসতে পারবে।

গোবর্ধন হতাশার সুরে বলে, আমি আরও এদিকে ভাবছিলুম

যে, কদিন ছুটি নিয়ে একটু বাইরে বেড়িয়ে আসবো সবাই মিলে। সুযোগ তো বড় একটা হয় না।

—কেন, এই না শুনলুম দুর্গার বন্ধুর বোনের বিয়েতে তোমরা সব জামসেদপুর যাচ্ছো!

—ও, আপনি বুঝি তাই মনে করে দেশে ফিরে যেতে চাইছেন?

—না, তা হবে কেন!

—তবে!···দুর্গার কার না কার বিয়ে সে দুর্গা যাবে, আমাদের কি!

মালিনী বাধা দিয়া বলে, না তা কি হয়! সে দিন ক[illegible] করে তারা এসে বলে গেল।

—সে দুর্গাকে বলেছে···আচ্ছা বন্ধুর বোনের বিয়ে, [illegible]ৎসবে আমি কে? যেতে হয় ওর মতো ও জামসেদপু[illegible] যাবে। আমরা মধুপুর দুমকা—এই দিকটা ঘুরে আসবো। কি বলিস বাবলু, আমি তুই আর দিমমা!

বাবলু মালিনীর কোলে বসিয়া দুষ্টামি করিয়া হাসিয়া বলে, ইললি, মার ছঙ্গে আমি জামসেদপুর যাবো।

—বেশ তুই যাস জামসেদপুর আর আমরা দেখিস কেমন বেড়িয়ে আসবো রেলগাড়ি চড়ে।

বাবলু পালটা জবাবে বলিয়া ওঠে, মায়ের ছঙ্গে আমি জামসেদপুর যাবো ঘোড়াগাড়ি চড়ে।

মালিনী হাসিয়া বাবলুকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরে। কৃত্রিম বিস্ময়ের ভাব চোখে মুখে ফুটাইয়া বলে, ঘোড়াগাড়ি চড়ে জামসেদপুর যাবে নাকি!

বাবলু গর্বিত চোখে হাত তুলিয়া উদ্দিষ্ট গাড়ির ঘোড়াটার একটা পরিমাপ দিবার চেষ্টা করে: এই এত্ত বড় ঘোড়া, উই ছাত পর্যন্ত।

মালিনীর বিস্ময় তখনও কাটে নাই। একদৃষ্টে সে শুধু বাবলুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। বাবলু গোবর্ধনের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলে, কাউকে নেবো না—শুধু আমি আর মা।

হঠাৎ ষ্টিলের গামলার গায়ে যাত্রী পিপীলিকা কয়টির সতর্ক অবতরণ লক্ষ্য করিয়া বাবলু লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া তারস্বরে চেঁচাইয়া ওঠে: এসে গেছে, এসে গেছে ষ্টিমার ঘাটে; এইবার নামো, নামো সব।

সামনে খোলা বঁটি ও তরকারির ঝুড়ি। সামান্য একটু অসাড়-ধানতার জন্য একটা অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারে। গোবর্ধন গম্ভীর গলায় বাবলুকে সমঝাইয়া দেয়, আ কি হচ্ছে বাবলু! খাবে এইবার একটি গাঁট্টা। বসো চুপটি করে!

হ্রস্ব একটি ইললি শব্দ করিয়া বাবলু ভয়ে ভয়ে একমুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়ায়, আর গোবর্ধনের খবরদারির প্রতিবাদ হিসাবে মালিনীর গলায় থাকিয়া থাকিয়া চিমটি কাটে।

কথার মোড় ঘুরাইয়া গোবর্ধন বলে, তা হলে দেখুন, হয় তো নিয়ে ফেলি ছুটি।

মালিনী স্মিতহাস্যে বলে, বেশ তো দুজনে জামসেদপুর ঘুরে এসো। তাতে আর কি হয়েছে। ছুটিকে ছুটিও নেওয়া হবে...

টিপ্পনি কাটিয়া গোবর্ধন বলে, রথ দেখা আর কলা বেচা দুইই হবে বলছেন।

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, তা হয় বটে।

একটু পরে হতাশার সুরে গোবর্ধন বলে, তা হলে আপনি দেখছি শেষ পর্যন্ত শতনামপুরেই ফিরে যাবেন সংকল্প করেছেন।

—না সংকল্প আর কি।

—তবে থেকে যান না আরও দুটো দিন। না কি, ভালো লাগছে না এখানে দেশ-ঘর ছেড়ে।

—না দেশ-ঘর ছেড়ে বলে কি! কি-ই আর এমন অপৈদিস দেবা ফেলে এসেছি সেখানে!

—তবে! এত তাড়া কেন ফিরে যাবার। এক তো আছেন সেখানে কালীবাবু। তা তিনি তো শুনলুম চাষীদের স্বার্থ নিয়েই মেতে আছেন। আপনার কথা হয়তো তাঁর মনেই নেই।

মালিনী বাধা দিয়ে বলে না মনে ঠিকই আছে, তবে সে হল ঐ এক ধরনের মানুষ। সাংসারিক ব্যাপারে একেবারেই মাথা

থামাতে চায় না। আর শুধু আমার কথা বলে কি, নিজের কথাই কি তার মনে থাকে!

—একেবারে আত্মভোলা শিব আর কি, না!

—হ্যাঁ, শিবই বটে কিন্তু অচেতন নয়, সচেতন শিব। আত্মভোলা কথাটায় আবার তার যথেষ্ট আপত্তি আছে। ঘটেছিল কি না এই ধরনের একটা ব্যাপার একদিন, তাই বলছি!

—তাই নাকি! গোবর্ধন অট্টহাসিয়া বলে, আপনি কিন্তু বেশ গুছিয়ে বলতে পারেন। এত ভালো লাগে!

মালিনী সপ্রতিভ হাসিয়া বলে, হ্যাঁ—বলি বটে কিন্তু সব কথাই আমার প্রতিধ্বনি। একটি কথাও আমার নিজের নয়।

গোবর্ধন পায়চারি করিতে করিতে বলে, যাই বলুন, কালীবাবু কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও এমনটি সুন্দর করে বলতে পারতেন না—এ আমি জোর করে বলতে পারি।

মালিনী কি বলিবে ইহার উত্তরে?

গোবর্ধন বলিয়া যায়, তা হলে ঐ কথাই রইলো। আপনি থাকছেন। অ্যাদ্দিনপর কলকাতা এলেন, শহরটাই তো ভালো করে দেখা হলো না! এই তো দুর্গাই বলছিল…

মালিনী বাধা দিয়া বলে, না দুর্গাকে আমি বুঝিয়ে বলেছি। ওর অমত হবে না।

হঠাৎ ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিয়া যায় যে, মোটামতো চশমা-

পরা একজন বাবু নাকি গোবর্ধনের প্রতীক্ষায় একতলায় বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছেন।

গোবর্ধন সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করে, মোটামতো, চশমা-পরা···আচ্ছা বসতে বল, যাচ্ছি।

এই সময়টা দুর্গা চিলেকোঠার রান্নাঘরে খবরের কাগজের 'খাবার ঘর'-এর অনুশাসন অনুযায়ী ডিমের মোরব্বা বানাইয়া গলদঘর্ম হইতেছিল। এতক্ষণে মাত্র কয়েকখানা নমুনা হিসাবে ভাজিয়া গোবর্ধনের সমর্থন লাভের জন্য তাড়াতাড়ি দোতলায় লইয়া আসিল।

এ সব দুর্গা দেখিয়া শিখিয়াছে। দেখে সঙ্গতিপন্ন ঘরের কেতা-দুরস্ত হাল আমলের ফরসা বউরা এক পোয়া ময়দায় আধ সের ঘি ঢালিয়া ডিম চিনি পেস্তা বাদাম সহযোগে 'ফরগেট-মি-নট' নামক উদ্ভট খাদ্য সামগ্রী তৈয়ারি করে 'ওগো শুনছো'-দের পরিতোষনের জন্য, সেও করে গোবর্ধনের মন পাইবার আশায়।

দোতলার সিঁড়ির মুখে গোবর্ধনকে দেখিয়াই দুর্গা উচ্ছল হইয়া বলে, এই—এই শোনো! চল তো দেখবে টেস্ট করে কেমন হয়েছে। বহুৎ কসরৎ করে ফরমূলা পেয়েছি—ডিমের মোরব্বা। লক্ষ্মীটি···

গোবর্ধন যেন শুনিয়াও শুনিল না। চটির শব্দ করিতে করিতে দুই চার ধাপ নিচে নামিয়া গিয়া হঠাৎ দুর্গার দিকে কটাক্ষ

কুরিক্কা বলিয়া উঠিল, তুমি ওঁকে শতনামপুর ফিরে যেতে বলেছ! ··এত ছোট মন তোমার!"

প্রসন্ন সুন্দর মুখখানা যেন মুহূর্তে পাংশু বিবর্ণ হইয়া যায়। লাল ঠোঁট কালো হইয়া থর থর করিয়া কাঁপে। অস্ফুটে দুর্গা বলে, যাওয়া সম্বন্ধে আমি তো ওঁকে কোনো কথাই বলিনি। উনিই বরং বলছিলেন···

—থাক, আর সাফাই গাইতে হবে না তোমায়, ঢের হয়েছে, হিপক্রিট।

জিভ দিয়া বিষ ছিটাইয়া গোবর্ধন সোজা নিচে নামিয়া যায়। দুর্গা হতবাক। মোরব্বার প্লেটটা শক্ত মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া সে শুধু রেলিং আঁকড়াইয়া চোখ বুজিয়া রহিল। মুহূর্তের জন্য ভাবিল, মোরব্বাগুলি ডিমের না হইয়া বিষের হইলে কেমন হয়!

স্বর্ণাভরণা একখানা সুডৌল মণিবন্ধ চকিতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এতদিন হইয়া গেল, বাড়িটায় মানুষ আছে বলিয়া মালিনীর কোনোদিন মনে হয় নাই। খড়খড়িওয়ালা পনেরো বিশটা বড় বড় জানালা যেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঘরের কথা গোপন করিয়া রাখে। কৌতূহলী মালিনী কিছুক্ষণ জানালার গরাদ ধরিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া থাকে।

এখানকার প্রতিবেশীরাও যেন কেমন একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। চেনা-জানার শত যোগাযোগের সম্ভাবনা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় কেমন সব রঙবেরঙের পর্দা সন্তর্পণে টানিয়া রাখে। চোখাচোখি হইলে না দেখার ভান করে, জিজ্ঞাসা করিলেও ভালো মুখে দুইটা কথা কয় না। কাহারও সম্পর্কে কাহারও কোনো বীতরাগ নাই—অনুরাগেরও বালাই গিয়াছে। আশ্চর্য!

দেখছেন কি মণিমা?—দুর্গা আসিয়া মালিনীর পাশে দাঁড়ায়।

—কিছু না, এমনিই। বাবলু কোথায়?

—নিচে, বোধ হয় ওঁর কাছে।

—আজ তো আবার আপিস!

—হ্যাঁ, আরম্ভ হলো আর কি আবার ছদিনের ধাক্কা। কম ভোরে উঠতে হয়!

—ভাঁড়ার দিয়ে এলে বুঝি?

—হ্যাঁ, সব গোছগাছ করে দিয়ে এলাম। বাব্বাঃ, সকালবেলা

উঠে যা হুড়োহুড়ি লাগে!··· পিতমের আজ আবার অসুখ করেছে।

—তাহলে!

—তাহলে আর কি ওঁকেই যেতে বললাম বাজারে। ঠাকুর সঙ্গে যাক। তা ঐ তো নিচে বসে কাগজই পড়ছে!

গত রাত্রে স্বামীস্ত্রীতে যে মর্মান্তিক কলহ হইয়া গিয়াছে দুর্গার কথাবার্তায় আজ সকাল বেলা তাহার কিছুমাত্র রেশ নাই। বেশ হাসি খুশ সপরিতৃপ্ত ভাব, ভোর না হইতেই কেমন সংসারে সংসারী সাজিয়া কাজে নামিয়াছে। অথচ আড়ি পাতিয়া রাত্রে মালিনী এই দুর্গাকেই গোবর্ধনকে বলিতে শুনিয়াছে :

তুমি মর, বুঝলে। আমি কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি মর। তুমি না মরলে আমার শান্তি নেই।

উত্তরে গোবর্ধন বলিয়াছে, বিষ আমি তোমাকে খাওয়াতে পারি; এ আমি পারি তুমি জানবে। জানতেও পাবে না তুমি যে, কে তোমায় বিষ দিলে। কিন্তু আমি তা চাই না। আমার তাতে আনন্দ হবে না। আমি চাই যে তুমি আমার হাত থেকে নিয়ে খাবে; আমি তোমায় কাপে করে গুলে দেবো।

অন্ধকারে মালিনী কাহারো মুখ দেখিতে পায় নাই, শুধু কথা বলিতে শুনিয়াছে। কালো মনের কালো কালো কথা। সে কী বীভৎস সুন্দর। দাম্পত্য জীবনে গরমিলের বিষ যেন আকণ্ঠ ফেনাইয়া উঠিয়াছে দুইজনের।

কিছুক্ষণ কাটিয়া যায়। মালিনী না জানার ভান করিয়া বলে, কাল আবার কথা কাটাকাটি লাগলো কি নিয়ে, রাত্রে!

বিষয়ের গুরুত্বটা হালকা করিয়া দুর্গা জবাব দেয়, ঝগড়া একটা না একটা তো আমাদের নিত্যিই আছে! নইলে পেটের ভাত হজম হয় না!

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিজ্ঞের স্বরে মালিনী বলে, ঝগড়া থাকা ভালো। ভুল বোঝা-বুঝিটা কম হয়। মনের মিল থাকে। কাঁটাটা আবার এইখানেই। চলিতে ফিরিতে দিনরাত খচ্ খচ্ করিয়া বেঁধে।

একটু করুণ হাসিয়া দুর্গা বলে, না অতটা আবার ঠিক নয়; অত করে বলবেন না।…মনের মিল!…

অন্তস্তল হইতে শক্ত একটা দলা যেন হঠাৎ দুর্গার কণ্ঠনালীতে উঠিয়া আসে। অশ্রুকরুণ চোখে ভাঙ্গা গলায় বলে, সে আর এ জনমে না।

শত চেষ্টা করিয়াও দুর্গা শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলাইতে পারে না। পাঁচটি কথা বুক ফাটিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়।

মালিনী সান্ত্বনা দেয়: ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই।

বলিতে নাই ঠিকই। বলিয়া মর্যাদাও বাড়ে না। কিন্তু এ আত্ম-অবমাননায় বোধ হয় দাহ কমে; সুখ না হইলেও হয়তো সোয়াস্তি পাওয়া যায়।

আহত অভিমান হঠাৎ অন্তস্তল ফুঁসিয়া ওঠে দুর্গার। চাপা

আর্তকণ্ঠে বলে, আমি ওকে কি-ই না দিয়েছি···কিন্তু ও আমাকে এমনি চিরকাল অবজ্ঞা করে গেল মণিমা·· আমার জীবনে ও যে কত বড় অভিশাপ!

মালিনীর চোখও সজল হইয়া আসে। কান্না থামাইতে গিয়া চোখের জল ফেলিয়া বলে, দিতে তো অনেকেই চায়, নিতে পারে কজনা!

বুকের মধ্যে ছাইচাপা আগুন; চোখের জল পড়িয়া শুধু ঝলসানো ভাপ ওঠে।

কিছুক্ষণ কাটিয়া যায়। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনার স্তূপে নিঃসঙ্গ দুইটি মন কিছুক্ষণ মাছির মতো ডুবিয়া থাকে।

একটু পরে মালিনী অন্য কথা পাড়ে। সামনের বড় বাড়িটার দিকে তাকাইয়া বলে, মস্ত বড়লোকের বুঝি, না?

দুর্গাও সামলাইয়া নিয়াছে ইতিমধ্যে। বড় বাড়িটার দিকে তাকাইয়া উদাসীনভাবে বলে, হ্যাঁ, খুব বড় এটর্নি।

মালিনী এসব কথা জন্মচৈতন্যে শোনে নাই। একটু অবাক হইয়া বলে, এন্টনি কি?

অতি দুঃখেও হাসি পায় দুর্গার। বলে এন্টনি না, এটর্নি। উকিলের উকিল।

মালিনী কোনো কথা কয় না। সম্ভ্রমে চোখ দুইটি শুধু বড় বড় হইয়া যায়। দুর্গার মুখের উপর হইতে মালিনীর দৃষ্টিটা উকিলের বাড়ির উপর পিছলাইয়া পড়ে।

দুর্গা বলিয়া যায়, বিস্তর টাকা করেছেন শুনি ভদ্দরলোক, কিন্তু কার ভোগে যে লাগবে এই ঐশ্বর্য !

—কেন, ছেলেপুলে নেই ?

—একটিও না। হয় আর মরে মরে যায়।

—আচ্ছা এরই বা বিত্তান্ত কি ! অনেক বড়লোকের ঘরেই এই কথা শুনি।

—কি জানি।

—অথচ দ্যাখো গরীবের ঘরে মা ষষ্ঠীর দয়ার অন্ত নেই।

'তাই তো দেখি। আত্মীয় স্বজন কেউ নেই !

কেউ নেই। এক আছে ঐ ভাইপো।…ঐ যে ন-দশ-বছরের ফুটফুটে একটা ছেলে গাড়ি-বারান্দায় এসে মাঝে মাঝে ঘুর ঘুর করে না।

—বেশ ফরসাপানা !

—হ্যাঁ, ও-ই সব পাবে আর কি।

কে, কি সব পাবে ? স্মিত হাসিয়া ঘরে ঢোকে গোবর্ধন। হাতে খবরের কাগজ।

এটর্নির উত্তরাধিকার লইয়া দুর্গা ও মালিনীর মধ্যে যে আলোচনাটা চলিতেছিল এইখানেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাবলুর মাথার চুলগুলিতে হাত দিয়া পাট করিতে করিতে দুর্গা বলে, না এই উকিলবাবুর কথা হচ্ছিল। বলছিলাম যে ভদ্দর লোকের এত টাকা অথচ কেউ ভোগ করবার নেই।

এই ব্যাপার : গোবর্ধন বেতের মোড়াটা টানিয়া বসিয়া পড়ে
ঈষৎ হাসিয়া মালিনীর দিকে তাকাইয়া বলে, তারপর কি ঠিব
করলেন, যাবেন না থাকবেন ?

দেখা হইলেই গোবর্ধনের মুখে ঐ এক কথা—কি ঠিব
করলেন ? ···মালিনী কোনো উত্তর করে না। দুর্গার দিবে
তাকাইয়া শুধু একটু হাসে।

গোবর্ধন বলে, না আপনার কথাই ঠিক রইল দেখছি। শেষ
পর্যন্ত গিয়ে তবে ছাড়লেন।

উক্তিটা কেমন যেন একটু বাঁকা-বাঁকা ঠেকে মালিনীর কাছে।
একটু বিব্রত হইয়া বলে, কি রকম হলো শুনি—

কিছু না এমনিই বললাম—বসুন! আচ্ছা, আপনার দেশের
কথা বলছি, সুজা নদীর খালের দখল নিয়ে ওখানকার স্থানীয়
জমিদার চৌধুরিদের সঙ্গে প্রজাদের যে বিরোধ চলছিল
বলেছিলেন না, তাতে কালীবাবু বুঝি প্রজাদের পক্ষ
নিয়েছিলেন।

কৌতূহলী মালিনী শশব্যস্তে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ, কিন্তু কেন!

খবরের কাগজের পাতা উলটাইতে উলটাইতে গোবর্ধন বলে,
কেন জিগগেস করলাম বলছেন!···আজকের কাগজে ঐ বিষয়ে
একটা খবর বেরিয়েছে। অবিশ্যি বিস্তারিত কিছুই লেখেনি,
শুধু ব'লেছে এই যে—গোবর্ধন স্বাধীনভাবে ইংরেজি সংবাদের
বাংলা তর্জমা করিয়া যায়—লিখছে কিছু দিন আগে সুজা

নদীর খাল কাটা সম্পর্কে স্থানীয় ঘিওরের এলাকায় জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে যে দাঙ্গা হয়, সেই দাঙ্গার মামলার রায়ে আদালত কালীচরণ চক্রবর্তী এবং স্থানীয় আরও চারজন কৃষক কর্মীকে দোষী সাব্যস্ত করে নয় মাস কারাদণ্ড এবং তিন শত টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।...দায়রা আদালতের রায়, সুতরাং হৈ-হাঙ্গামা করেও যে বিশেষ একটা ফল হবে তা মনে হয় না। এই তো খবর।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গোবর্ধন বলে, এখন এ অবস্থায় আপনি সেখানে ফিরে গিয়েই বা কি করবেন।... মুশকিল!

গোবর্ধনের কথায় সায় দিয়া দুর্গা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলে, তা তো সত্যিই। একা উনি সেখানে ঐ গণ্ডগোলের মধ্যে গিয়ে পড়ে কি-বা করতে পারবেন।

মালিনী নিরুত্তর। করিবার না থাকিলেও ভাবিবার আছে। শঙ্কাহত মন তাহার ততক্ষণে শতনামপুরের উদ্দেশে উধাও হইয়া গিয়াছে। মাথার কাপড়টা যে কখন খসিয়া পড়িয়া যায়, মালিনী তাহা টেরও পায় না।

গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে বাবলুর উৎকণ্ঠাও সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। দুই-এক পা করিয়া ও মালিনীর দিকে আগাইয়া গিয়া সন্তর্পণে তাহার আঁচল ধরিয়া সান্ত্বনার সুরে বলে, দিমমা ও দিমমা!

মালিনী রোজ বাবলুকে ভুলায়, আজ বাবলুই মালিনীকে ভুলাইতে চেষ্টা করে।

উ, কি বাবা—সচকিত হইয়া মালিনী ত্রস্তে মাথার কাপড়টা তুলিয়া দেয়। তারপর আঁচলে চোখ মুছিয়া বাবলুকে কাছে টানিয়া নেয়।

শিশুরা এত মায়াও জানে।

গোবর্ধন হালকা গলায় মালিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ওঠে, আপনি যখন আমাকে প্রথম একদিন এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, সেদিন আমি কিন্তু এর ততটা গুরুত্ব দিইনি। ভেবেছিলাম, জমিদার আর প্রজার মধ্যে হাঙ্গামা, ও তো লেগেই আছে আমাদের দেশে আকছার। কিন্তু ব্যাপারটা যে এতদূর পর্যন্ত গড়াবে তা ··কি কাণ্ড!

খবর শুনিয়া দুর্গা একেবারে থ বনিয়া গিয়াছে। গোবর্ধনের মুখের দিকে তাকাইয়া শঙ্কিত প্রশ্ন করে, আচ্ছা এখন কোথায় রেখেছে কালীদাকে?

কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া গোবর্ধন বলে, রেখেছে কোথায়··· এখন আন্দাজে আমি কি করে বলবো কোথায় রেখেছে। লিখেছে যা তা তো শুনলেই।

দুর্গা আর ভাবিতে পারে না। চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলে, তা হলে কি হবে!

গোবর্ধন উদাসানভাবে হাত উলটাইয়া বলে, কি আবার হবে!

হবে চার বছর আগে যা হয়েছিল, কিছুকালের জন্যে আবার শ্রীঘর বাস।···আরে বাবা, ও রাজা-উজিরের সঙ্গে লড়াই করা কি আমাদের সাধ্যি!

মালিনী যেন জলে পড়িয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অস্ফুটে বলে, এই কারণেই হয়তো আমায় তখন তাড়াতাড়ি করে কলকাতা পাঠিয়ে দিলে। আমি কি কিছু বুঝতে পেরেছি!

গোবর্ধন মানুষের মন বোঝে না। সান্ত্বনার বদলে ভূয়া যুক্তির ছড় টানে, বুঝেই বা কী করতেন। তাকেই সামলাতে পারতেন, না দাঙ্গা ঠেকাতে পারতেন, বলুন!

—না তার হয়তো কোনোটাই পারতাম না, তবে···

—কি তবে?

—তবুও···কিন্তু এখন তোমরা আমায় কি করতে বলো: অবরুদ্ধ আবেগ ঝনঝন্ করিয়া ওঠে মালিনীর কথায়।

কী-ই বলা যায়। মাথার একরাশ চুলের মধ্যে আঙুল চালাইয়া দিয়া গোবর্ধন বলে, এ ব্যাপারে আপনাকে এখন কী-ই বা করতে বলবো!

আমি যাই একবার ঘুরেই আসি।

—দেখুন সে আপনি···

—আজকে তো আর গাড়ি নেই দিনের বেলায়, না?

—শতনামপুরের গাড়ির কথা বলছেন? না, দিনের বেলায় যে

গাড়ি ছিল সেটা তো আর এখন ধরা সম্ভব হবে না। এখনই তো সময় হয়ে গেছে। এর পর আছে আপনার সেই রাত আটটায়।

—এর মাঝখানে আর কোনো ট্রেন নেই?

—না, আর ট্রেন কই! যেতে হলে ঐ আটটার ট্রেনেই যেতে হয়।

—তা হলে ঐ রাত আটটায়ই।

—যেতে চাইছেন যান, তবে সেখানে গিয়ে করবার আপনার বিশেষ কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না।

বাধা দিয়া দুর্গা বলে, না তা হলেও এই অশান্তির মধ্যে দিন কাটানোর তো কোনো মানে হয় না। একবার উনি ঘুরেই আসুন।

গোবর্ধন অসহিষ্ণু হইয়া বলে, আহা সে কথা তো বলছিই আমি।

দুর্গা একটু অপ্রস্তুত হইয়াই চুপ করিয়া যায়।

মালিনী একটু করুণ হাসিয়া বলে, আমার খালি উদ্বেগই সার, নইলে করতে আর কার জন্যে আমি কতটুকু পেরেছি।

একটা সমূহ সর্বনাশের কালো ছায়া মুহূর্তে মালিনীর সারা মুখখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ঝাপসা দৃষ্টি জুড়িয়া মালিনীর চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে—শুধু এক সার মোটা লোহার গরাদ।

একুশ

শতনামপুরের সংকল্প সাধনা সার্থক হইয়া ওঠে নাই। ঘিওরের চরে সূর্য সাক্ষী করিয়া একদিন যাহারা কঠিন শপথ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের বজ্রমুষ্টি আজ শিথিল; নির্দিষ্ট কর্মপন্থা সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনার অভাবে অবিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কালীচরণ নাই, গোলাম হোসেন নাই, জাবালি বাগদিরাও সোঁটা-সোঁটা কালো দাগ পিঠে করিয়া হাজতে চলিয়া গিয়াছে। সারা গণ্ডগ্রামে আজ এমন কেহ নাই যে ঘিওয়ের খালের মুখে দাঁড়াইয়া জোর গলায় একটা হাঁক ছাড়িয়া দশটা লোক এক জায়গায় জড়ো করিবে।

সমুদ্ধত মুষলের দৃকপাতহীন আস্ফালনে চরকাসুন্দি মৌজার প্রতিরোধশক্তিও ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া গিয়াছে।

ঘরপোড়া গরুর মতোই এখন স্থানীয় অধিবাসীরা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সম্ভাবনায় থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া ওঠে। উঁচু মুখে দুইটা কথা কয় না; এমন কি পাঁচটা লোক একত্র বসিয়া আলাপ আলোচনা করিতেও ভয় পায়। হাল-লাঙ্গল খোয়াইয়া

বিপর্যস্ত মৌজার প্রত্যেকটা চাষী-পরিবার এখন শুধু তাহাদের ঝলসানো দোচালাগুলির মধ্যে প্রাণ্ণ হাতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। জীবন দিয়া যে বাঁচিবার উপায় করিয়া লইতে হইবে একদিন—ইতিপূর্বে এ কথা বোধ হয় তাহাদের কোনোদিনও মনেও হয় নাই।

সুজা নদীর নিস্তরঙ্গ জলেও যেন আজ শতনামপুরের কলঙ্ক পড়িয়াছে। গ্রামের বউদের মুখ ভার, স্নানের ঘাটে আসিয়া এখন আর তাহারা কালো জল আলো করিয়া দাঁড়ায় না। হাজা মজা এই বুড়ীর নদীর বুকে চর-কাসুন্দি মৌজার ধূলাকাদা মাখা ন্যাংটা শিশুদের আর সে মাতামাতি নাই। সর্বাঙ্গ জলে ডুবাইয়া কাজলি মুংলি-বুধি গাইরাও আর বড় বড় চোখ মেলিয়া সঘন নিঃশ্বাসে নদীর জলে প্রাণসঞ্চার করে না।

নদীর ঘাটে খেয়া পারের কড়ি লইয়া ঘেসুনিরা আগে কত ঠাট্টা-মসকরা করিত; বুড়া বসন্ত মাঝিকে শ্যামকানাই বলিয়া ডাকিয়া উচ্ছল হাসিতে পারাপার কেমন মুখর করিয়া তুলিত। এখন আর কারো মনে সে রকম আনন্দ নাই। সহাস্য মুখগুলিতে কে যেন বিষাদের ছায়া লেপিয়া দিয়াছে।

নদীর পশ্চিম তীরে বাগদি পাড়া—সন্ধ্যা হইতে না হইতেই রোজ মাদলের বোলের তালে তাল রাখিয়া নৃত্যছন্দে দুলিয়া উঠিত। তাড়ি খাওয়া ঝুমুরের সুর সুজা নদীর জলে তরঙ্গায়িত হইয়া সারা গ্রাম-দেহে থাকিয়া থাকিয়া একটা শিহরণ

দিয়া যাইত। এখন জাবালি বাগদিকে হারাইয়া সারা বাগদি পাড়াটা যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে।

পশ্চিম পাড়ার গোরাচাঁদের আখড়ায় আবহমান কাল ধরিয়া হরিনাম সংকীর্তন চলিয়া আসিতেছে। বৈকাল হইতেই নাম-গুণগান সাড়ে দশকুশী তালে ঢিমায় আরম্ভ হয়; তারপর রাত্রি গভীর হইলে সেই নাম-সংকীর্তন সাড়ে বত্রিশকুশী তাল পর্যন্ত বাড়িয়া গ্রামের মধ্যে রীতিমতো একটা সুরন্তন্ত্রের সৃষ্টি করে। যাহারা এই রসের প্রকৃত রসিক, তাহারা অনেক সময় প্রকাশ্য আসরের মাঝখানেই লোকলজ্জা ভুলিয়া ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে; এবং পরে আবার মাথায় জল হাওয়া দিয়া তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিতে হয়। আর নাম-গানে যাহাদের একান্তই মন মজে না তাহারা কীর্তনের শেষে অন্তত লুটের বাতাসা পাইয়া বেশ পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। বৈষ্ণবকুলের লীলাক্ষেত্র এই গোরাচাঁদের আখড়া যেন উষর জনপদের বুকে একটিমাত্র পান্থপাদপ—ইহসংসারে বীতস্পৃহ হইয়া কত তাপিত চিত্ত নিত্য এখানে শীতল হইয়া যায়। কিন্তু কালীচরণের জেলে চলিয়া যাওয়ার পর সমস্ত আখড়াটাকে ঘিরিয়া যেন একটা বিষাদের কালো ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। খোলের বোল সহ নাম-গান এখন আর মুখে মুখে উৎসারিত হইয়া প্রাণ মাতাইয়া তোলে না। মানুষের বিরহে শতনামপুরের অধিবাসীরা আজ দেবতাকে ভুলিতে বসিয়াছে।

এদিকে চাষী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কাজও প্রায় অচল হইয়া আসিয়াছে। জরুরি কাজের তাগিদ লইয়া আসিয়া দূর-দূরান্তের চাষীরা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়; অথচ সমিতির পক্ষ হইতে আজ কাহারও একটি কথাও বলিবার নাই।

কর্ম-প্রবাহের মূল উৎসটি শুকাইয়া গিয়া সমগ্র প্রতিষ্ঠানই যেন আজ অচল হইয়া গিয়াছে।

ঘিওয়ের চরের আকাটা খাল আজ গভীর একটা ক্ষতের মতোই, জনপদের বুকে অসাফল্যের কলঙ্ক-স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। শতনামপুরে আজ এমন কেহ নাই যে বলিষ্ঠ হাতে এই কলঙ্ক ঘষিয়া তুলিয়া সোনার জলে স্বাক্ষর লিখিয়া দিবে।

সুনন্দাও আজ শতনামপুরের মতোই বিপন্ন অসহায়। মর্তে স্বর্গ রচনার সুখ-স্বপ্ন তাহারও হয়তো ভাঙ্গিয়া চূর হইয়া গিয়াছে। আশা নাই, ভরসা নাই, আঁকা বাঁকা পথের দিকে এখন বুঝি তাহার শুধু অনিমিখ চোখে তাকাইয়া থাকার পালা। কর্তব্য আছে কাজ নাই, বক্তব্য আছে কথা নাই, মন যেন আহত প্রাণের কণ্ঠলীন হইয়া মরমে মরিয়া থাকে সুনন্দার।

অনেকে অনেক কথা বলে। দুষ্টলোকে এক কথার সাত মানে করিয়া পঞ্চাশ কানে দিয়া বেড়ায়।

সুনন্দা কোনো প্রতিবাদ করে না। মিথ্যা কলঙ্কটুকু সম্বল করিয়া ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া থাকে।

উড়ো কথা বাতাসের আগে ছোটে—সুনন্দা বৈকুণ্ঠ লাহিড়ীর সংসার মজাইল।

ঘরের কথা চৌকাট ডিঙ্গাইয়া দেউড়িতে আসে—ও মেয়ে সামান্যি নয়।

স্নানের ঘাটে মুখ টেপা হাসির খোঁচা খাইয়া মুখ ভার করিয়া ফিরিয়া আসেন চপলাসুন্দরী। জলের ঘড়া সশব্দে উঠানে নামাইয়া রাখিয়া ভিজা গামছা দিয়া এলো চুল জোরে জোরে ঝাড়েন; আর তুচ্ছ কারণে সুনন্দাকে গালমন্দ পাড়িয়া মনের দুঃখ চোখের বারিধারায় বাহির করিয়া দেন।

অন্য কোনো সাধারণ মেয়ে হইলে এতদিন হয় তো মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিত। কিন্তু সুনন্দার মরিবার ইচ্ছা নাই।

আগে সুনন্দার এ শিক্ষা ছিল না। চুন হইতে পান খসিলেই মন বিষাইয়া আত্মঘাতী হইয়া উঠিত। কিন্তু এখন সুনন্দার মন শক্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতায় মামার বাড়ি থাকাকালে অনেক দেখিয়া শুনিয়া সুনন্দা এই অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছে।

একটা ঘটনা সুনন্দা ইহজনমে ভুলিতে পারিবে না। ঘটনাটা আবার তাহার মামার বাড়িটাকে কেন্দ্র করিয়াই।

বহুদিনের ব্যাপার হইলেও আজও ঘটনাটি সুনন্দার স্পষ্ট মনে আছে।

রাঙ্গা-মামীমার সঙ্গে রাঙ্গা-মামার ঝগড়া হইয়াছে। তিন দিন হইল কথাবার্তা একেবারে বন্ধ। এক মুহূর্তের জন্য কেহ কাহারো দিকে ভুলিয়াও ফিরিয়া তাকায় না। বিশেষ করিয়া সুনন্দার রাঙ্গা-মামা, রাঙ্গা-মামীমাকে দেখিলেই এক ঘরের দুয়ার দিয়া অন্য ঘরে চলিয়া যায়।

বাড়ির অন্য সকলে কিন্তু এ বিষয়ে তেমন কোনোই কৌতূহল প্রকাশ করে না। অন্য মামীরা বলে, রাঙ্গা-বৌয়ের ব্যাপার তো! সুনন্দার দিদিমার মতটাও অনেকটা সেই রকমই: বাহিরটা দেখিয়া ভিতরের কিছুই জানা যাইবে না, অন্তরে অন্তরে উহাদের প্রগাঢ় মিল আছে। হয় তো থাকিবেও বা। পরস্পর ঝগড়া হয়, আবার সেই ঝগড়ার নিষ্পত্তিও হইয়া যায়। ব্যাপারটা যেন একেবারে গা-সহা হইয়া গিয়াছে বাড়ির সকলের।

ঘটনার দিনের কথা। সুনন্দার বেশ মনে আছে, অধ্যাপক রাঙ্গা-মামা যেন কোথা হইতে সেদিন রাত্রে বক্তৃতা দিয়া ফিরিলেন। চোখে মুখে বেশ একটা হাসিখুশি সপরিতৃপ্ত ভাব, যেন মহৎ একটা কিছু করিয়া আসিয়াছেন। এমন কি রাত্রে খাইতে বসিয়া রাঙ্গা-মামা আবার নিজের উচ্ছ্বাসেই বক্তৃতার কথা সকলের নিকট বলিতে লাগিলেন।

স্বামীগরবিনী রাঙ্গা-মামীমার তো বুক ফুলিয়া সেদিন দশ হাত। সুনন্দার বেশ মনে আছে, রাত্রে পান সাজিতে বসিয়া রাঙ্গা-মামীমা আবার তাহার কানে-কানে বলিলেন, রাঙ্গা-মামার মতো বিদ্বান লোক নাকি সুনন্দার মামার বংশে কোনোদিন হয় নাই। রাঙ্গা-মামার হইয়া অতখানি গলা বাড়াইয়া বলিতে সুনন্দা রাঙ্গা-মামীমাকে সেদিন প্রথম শুনিল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ করিয়া বিছানায় যাইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জলের গ্লাশ হাতে রাঙ্গা-মামীমাকে সুনন্দা হাসিতে দেখিয়াছে। সে হাসিতে কোনো কপটতা ছিল না, ছিল না বিগত দিনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার ঈষৎ ছায়াপাত। সুনন্দার বেশ মনে আছে, রাঙ্গা-মামীমা আবার শুইতে যাইবার সময় তাহাকে 'টা টা' বলিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া গেলেন। দিদিমার ধমক খাইবার ভয়ে উত্তরে সুনন্দা আর কোনো কথা বলিল না; শুধু দূর হইতে বালিশের রঙ্গীন ঝাড়নটা তুলিয়া নাড়িতে লাগিল।

তারপর রাঙ্গা-মামীমা ঘরে দুয়ার দিয়া আলো নিভাইয়া দিলে সুনন্দাও চোখ বোঁজে।

পরের ঘটনাটুকু অতি সংক্ষিপ্ত।

ভয়ানক একটা হট্টগোলের মাঝখানে রাত তিনটার সময় সুনন্দার আচমকা ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। প্রথমটা একেবারে কিছুই ভাবিতে পারে না। বালতি, মানুষ, জল, চৌবাচ্চা

আগুন, ধেঁায়া, আলো, অন্ধকার, চীৎকার, হা-হুতাশ মিলাইয়া সমূহ বিপৎপাতের একটা ঝাপটা, স্নুনন্দার সমস্ত চৈতন্য-বুদ্ধিকে চকিতে নস্যাৎ করিয়া দেয়। পর মুহূর্তেই মনে হয় যেন অতিকায় একটা উন্মাদ তাড়া খাইয়া একতলার সব কিছু লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে দোতলার ঘরের ছাত ফাঁসাইয়া বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। আচ্ছন্নের অবস্থা কাটিয়া যাইতে কিছুক্ষণ সময় লাগে। তারপর চীৎকার আর হট্টগোলের সুরসূত্র ধরিয়া স্নুনন্দা বুঝিতে পারে যে, দোতলার বাথরুমের দরজা বন্ধ করিয়া রাঙ্গা-মামীমা আগুনে পুড়িয়া আত্মহত্যা করিতেছে; আর বাহির হইতে রাঙ্গা-মামা তাহার রুদ্ধ দুয়ারের উপর সশব্দে চড়, কিল, লাথি, ঘুসি মারিয়া উন্মত্তের মতো চীৎকার করিতেছে : নমিতা, দরজা খোল নমিতা, কোনো অধিকার নেই মরে যাবার তোমার নমিতা, নমিতা দরজা খোল, নমিতা…

কোনো উত্তর নাই। রাঙ্গা-মামীমার প্রাণান্তিক উষ্ণশ্বাস তখন বোধ হয় শোবার ঘরের ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া গাঢ় কালো ধেঁায়ার কুণ্ডলীর মধ্যে পাক খাইতে খাইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। দরজা ভাঙ্গিয়া রাঙ্গা-মামীমাকে বাহির করা হয় যখন—তখন সব কিছু শেষ হইয়া গিয়াছে।

থস্‌থসে খানিকটা কালো গরম মাংসের স্থানে স্থানে ছিটে-ফোঁটা ফরসা রঙ তখনও নমিতাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। অতীতের ঘটনা

—সব কথা সুনন্দার আজ ভালো করিয়া মনেও নাই।
নমিতার পোড়া অঙ্গের উপর এখন বিস্মৃতির কালি পড়িয়াছে;
রাঙ্গা-মামীমার কথা এখন সুনন্দার একরকম মনেই হয় না।
কিন্তু সব কিছু বিস্মৃত হইলেও রাঙ্গা-মামার সেই বুক ফাটা
চীৎকার সুনন্দা আজও ভুলিতে পারে নাই—নমিতা, দরজা
খোল নমিতা, কোন অধিকার নেই মরে যাবার তোমার
নমিতা···স্বপ্নের ঘোরে এখনও অনেক রাত্রে রাঙ্গা-মামার সেই
তীব্র আর্তকণ্ঠ সুনন্দার কানে মাথা কোটাকুটি করে—অধিকার
নেই মরে যাবার তোমার নমিতা···

সুনন্দা ভাবে, সত্যই তো, কি অধিকার ছিল! কি অধিকার
আছে মানুষের স্বেচ্ছায় মরিয়া যাইবার।

ঠিক যুক্তিবোধের দরুন যতটা নহে, বিশেষ একটা রাত্রির
পটভূমিকায় রাঙ্গা-মামার সেই সতর্ক আর্তনাদ সুনন্দার প্রাণের
দুয়ারে এখনও যেন জাগ্রত প্রহরী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

মরণ সুনন্দার কপালে লেখা নাই। সুন্দর ভবনে কালীচরণের
পথ চাহিয়া সুনন্দা এখন বাঁচিয়াই মরিয়া রহিবে।

বাইশ

আজ ইনটারভিউর দিন। বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠ লাহিড়ীর প্রাণান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এবং সুনন্দার সবিনয় নিবেদনের উত্তরে জেল কর্তৃপক্ষ মাত্র এক ঘণ্টা কালীচরণের সহিত সুনন্দার সাক্ষাৎকারের সময় মঞ্জুর করিয়াছেন।

কয়েকটা কথা বলিবার আছে সুনন্দার। অত্যন্ত জরুরি কথা। হয়তো জীবন-মরণই এবার নির্ভর করিতেছে সুনন্দার এই কথা কয়টির উপর।

ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে সুনন্দা দু-এক পা করিয়া জেল গেটের দিকে আগাইয়া যায়। চলার ভঙ্গীটা তাহার আজ অন্তরতম কথা কয়টির মতই ঋজু—কাটা-কাটা। কোনো বাহুল্য আবেগ নাই, টান্ টান্ চোখ নাক কপালে একটা শেষ বোঝা-বুঝির বেপরোয়া ভাব সুস্পষ্ট।

সশস্ত্র প্রহরীর কড়া-পড়া পাঞ্জার চাপ খাইয়া সদর জেলের 'মেন' গেটটা যান্ত্রিক শব্দে লোহার পাতের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়। আইয়ে: দ্বাররক্ষী সুনন্দাকে জেল-কম্পাউণ্ডের ভিতরে ঢুকিতে ইঙ্গিত করে।

কথা তো নয়, যেন যান্ত্রিক সম্বর্ধনা। সুনন্দা ত্রস্তে 'মেন'-গেটটা পার হইয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়ায়।

একটু পরেই জেল গেটের হাঁ-টা বন্ধ হইয়া যায়। মোটা লোহার শিকলটা আবার ময়াল সাপের মতোই গরাদগুলিকে শত পাকে জড়াইয়া ধরে।

চলিয়ে: আবার সেই যান্ত্রিক নির্দেশ। মানুষের গলা! শঙ্কাহত সুনন্দার নরম বুকটা হঠাৎ টিপ্ টিপ্ করিয়া ওঠে দ্রুত তালে।

সুনন্দার মুখে কথা নাই। শুধু অন্তরতম কথা কয়টি যেন তাহার প্রাণের অঙ্গনে সারি দিয়া কুচ-কাওয়াজ করিয়া ফেরে।

সামনেই আবার আর একটি লৌহ তোরণ। যন্ত্র সভ্যতার পরিপোষণকারী ধাতুর সাধু সমাবেশ। সুনন্দা একটু করুণ হাসে। ভাবে, কালীচরণের বাহুতে কতখানি শক্তি আছে আন্দাজ করিয়াছে ইহারা!

শাদা পাথরের নুড়ি বিছানো রাস্তার উপর দিয়া সুনন্দা লঘু ত্রস্ত পদক্ষেপে দ্বাররক্ষীর অনুসরণ করিয়া চলে।

দুই নম্বর গেটের ওধারে কালো রঙের মোটা একটা ওভারকোট গায়ে চাপাইয়া বদখদ চেহারার বিরাটকায় এক শান্ত্রী দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়া চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছিল! হঠাৎ পদশব্দে সচকিত হইয়া সঙ্গীনধারী লোকটা কি যেন সব আপনমনেই বিড়বিড় করিয়া নড়িয়া চড়িয়া দাঁড়ায়।

প্রথম নম্বর সান্ত্রী একটু রসিকতা করিয়া বলে, কেয়া করত বা হো। এইন তোহসর কাম হইতবা!

দ্বিতীয় নম্বর সান্ত্রী একটু বিরক্তবোধ করিয়া বলে, বহুৎ তু হললা মচায়াইত বা হো। হরবখত খোল্‌খোল...

—গোঁসা ভৈল বা?

—ভৈল না বা তো কা বা হো!

গেট খুলিয়া দিয়া দুই নম্বর সান্ত্রী সুনন্দাকে ভিতরে ঢুকিতে ইঙ্গিত করে। বলে, ইস্ জাগাপর থোড়া ঠ্যারিয়ে—হাম ওয়ার্ডার বাবুকো বোলা লাতা হ্যায়।

নির্জন করিডোরের উপর সান্ত্রীর নাল লাগানো ভারী বুটের শব্দ পোড়ো আস্তাবলে ঘোড়ার খুর ঠোকার মতোই কানে বাজে। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নাই। সমস্ত গরাদখানাটা যেন কবরের মতো নিঝুম হইয়া আছে। এক অজানা শঙ্কায় সুনন্দার বুকের ভিতরটাও কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে।

একটু পরেই আসিয়া হাজির হয় ওয়ার্ডার, বেঁটে গোলগাল চেহারার রীতিমতো একজন বাঙ্গালি ভদ্রলোক।

সুনন্দাকে লক্ষ্য করিয়া বলে, কালীচরণ চক্রবর্তী, আপনি দেখা করতে চাইছেন?

সুনন্দা কোনো কথা বলে না। শুধু অধীর হইয়া সবিনয় ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে।

ওয়ার্ডার লোক ভালো। দেশের দুর্বিপাকে বাহিরকে দেখিয়া

হঠাৎ ঘর ভুলিয়াছিল। হাসিয়া বলে, আচ্ছা আসুন আপনি আমার সঙ্গে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য যে বিবশতা সুনন্দার সমস্ত স্নায়ুটাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল এখন তাহা কাটিয়া যায়। কোনোদিকে দৃক্-পাত না করিয়া সুনন্দা ত্রস্ত পায়ে ওয়ার্ডারের অনুসরণ করে। করিডোরের দুই ধারে অন্ধকারের পূর দেওয়া ছোট ছোট অপরিসর ঘর। মানুষ ধরিয়া রাখা হয়। সুনন্দার কানের কাছে হঠাৎ যেন অনেকগুলি আড়ষ্ট জিভ ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিয়া ওঠে। ব্যর্থমনোস্কামনার প্রেত সব।

খানিকটা দূর অগ্রসর হইয়া করিডোরের একটা মোড়ের মাথায় ওয়ার্ডার দাঁড়াইয়া পড়ে। কোণের একখানি বেঞ্চির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সুনন্দাকে বলে, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি খবর দিই। তারপর ঐ তারের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আপনারা পরস্পর কথা বলবেন। এক ঘণ্টার বেশি কিন্তু আপনারা কথা বলতে পারবেন না।

স্বল্প পরিসর এই স্থানটুকুতে বেশ একটু আলো আছে। আবহাওয়াটাও এখানে একটু হালকা। পাশের উঁচুতে দুই-প্রস্থ মোটা তারের জাল দিয়া ঢাকা একটা বড় জানালা। তারের জালতির ফাঁকে ফাঁকে শাদা-কালো ঝুলগুলি সব বাতাসে ফুর ফুর করিয়া কাঁপে। সুনন্দার কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে শুধু একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে মোটা তারের জাল দিয়া ঢাকা

জানালাটির দিকে, যেন পলক পড়িবার ক্ষতিটুকুও পরে আর পূরণ করা যাইবে না।

মাকড়ের ত্রস্ত লঘুগতির মতো সূক্ষ্ম একটা সঞ্চরণশীল অনুভূতি যেন মুহূর্তে সুনন্দার পায়ের তলা হইতে উঠিয়া সারা দেহে ছড়াইয়া পড়ে। প্রসন্ন মুখখানিকে করুণ করিয়া দেখিতে না দেখিতে তাহার দুই ঠোঁটে ভর করিয়া নামে একটা বিষাদের কালো ছায়া। কেমন যেন একটু ঘুম-ঘুম পায় সুনন্দার।

হঠাৎ ওয়ার্ডারের পদশব্দে সচকিত হইয়া ওঠে সুনন্দা। ছোট পাখির আহত ডানার মতোই তাহার কোমল বুকটা থর থর করিয়া কাঁপে।

ওয়ার্ডার বলে, এইবার আপনি ঐ তারের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। বাইরে থেকে কথা বলবেন।

সুনন্দা একটু করুণ হাসিয়া অস্ফুটে বলে, বাইরে থেকে?

অনেক কথা মনে পড়িয়া যায় ওয়ার্ডারের। ভাবে—এই রকমই একখানি সুন্দর মুখ যেন দূর পাটগ্রাম হইতে তাহার পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। ওয়ার্ডার একটু সপ্রতিভ হাসিয়া বলে, আমার কোনো হাত নেই, এই অর্ডার।

ওয়ার্ডারের চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই সুনন্দার সজল চোখের দৃষ্টি জুড়িয়া তারের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায় কালীচরণ। চোখ দুইটি এখনও তেমন সমুজ্জ্বল। কারাগারের কাঠিন্য এখনও প্রশান্ত মুখখানির কোথাও এতটুকু ঠাঁই পায় নাই।

মৌসুমী সমুদ্রের ঢেউ যেন বুক ভাঙিয়া মিলাইয়া যায় সুনন্দার সারা দেহমনে। মুখে কথা নাই, দু-এক পা করিয়া সুনন্দা শুধু তারের জানালাটির দিকে আগাইয়া যায়।'

বিধি-নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া সুনন্দা যে শেষ পর্যন্ত তাহার সহিত জেলে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারিবে, কালীচরণ তাহা কল্পনাও করে নাই। সুতরাং আনন্দ অপেক্ষা বিস্ময়ের মাত্রাটাই কালীচরণের চোখে মুখে বেশি করিয়া প্রতিভাত হয়। সুনন্দার দিকে কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকিয়া কালীচরণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলে, সুনন্দা তুমি! বিস্ময়ের মাত্রাটা বেশি হইলেও কালীচরণের কথায় আন্তরিকতার টান কম ছিল না। তবু সন্দেহ আর সংশয়ে দোলায়মান মন সুনন্দার আবার জবর কাটিতে বসে, সে কি তবে প্রত্যাশিত নয়?

অবকাশ না থাকিলেও স্বেচ্ছায় আঘাত হানিয়া এইরূপ রক্তাক্ত হইতে সুনন্দার বেশ লাগে।

সুনন্দা কোনো কথা কয় না। নিঃশব্দে হাসিয়া কাঁদিয়া তারের জালতির উপর হাত বুলায়।

কালীচরণ বলিয়া যায়, সত্যি বলছি সুনন্দা, আমি ভাবতেই পারিনি।...দেখা করতে দিলে?

ভাবিতে না পারাটাই তো অস্বাভাবিক ঠেকে সুনন্দার কাছে। একটু করুণ হাসিয়া বলে, অনেক করে।

কালীচরণ বলে, ওয়ার্ডার যখন আমার কাছে গিয়ে প্রথম সংবাদ দিলে যে, 'তুমি এসেছো আমার সঙ্গে দেখা করতে···

কালীচরণের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সুনন্দা বলে, তখন তুমি শুনে খুব অবাক হলে—না!

কালীচরণ একটু থতমত খাইয়া যায়। বলে, অবাক হবার কথা নয় কি?

সুনন্দা কোনো কথা কয় না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কালীচরণ হাসিয়া বলে, কিন্তু আশ্চর্য দেখ, এতে করে আবার তোমার বিস্ময়ের কারণ ঘটেছে—না সুনন্দা?

ঈষৎ হাসিয়া সুনন্দা চোখ নামাইয়া নেয়। অস্ফুটে বলে, না, বিস্ময় আর কি।

এখনও তুমি ঠিক তেমনিই আছো সুনন্দা—এতটুকু বদলাও নি, সত্যি।

—একটুও না?

—কি জানি, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। বাস্তবিক এমন একটা মেজাজ করে রেখেছো সম্রাজ্ঞীর মতো, যে স্থান কাল পাত্র পর্যন্ত সে পরোয়া করতে চায় না। সুনন্দা আসছে, আর কি, অমনি জেলের গেটগুলো পর্যন্ত কুর্নিশ জানিয়ে আপনা থেকেই সব খুলে যাবে। আর তা দেখে আমাদের মতো

সামান্য লোকের যদি এতটুকখানি বিস্ময়ের কারণ ঘটল তো অমনি আর কি হয়ে গেল অপরাধ। ঠিক তাই নয় কি?

—ঠাট্টা করছো করো।

—ঠাট্টা কি, হিংসে করছি বলো। সত্যি আমি যদি ঐ রকম অভিমান করতে পারতাম!

—তোমরা কি আর আমাদের মতো এত ছোট ছোট অভিমান করো। তোমাদের অভিমান সব বড় বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর অভিমান।

—থামলে কেন, বলে যাও।

—বলবো বৈ কি।...চলে আসবার সময় চোখের দেখাটা দেবার পর্যন্ত সময় করতে পারলে না!

—করতে পারলাম না মানে করতে দিলে না বলো। একটু বুঝে দোষ দিও। সম্পর্কে পুলিশ আমার খুব আপনার জন নয় যে, বললেই অমনি সুনন্দার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়ে আনবে।

—বলেছিলে?

—বলেছিলাম।

—কি বলেছিলে!

—সুনন্দার সঙ্গে দেখা করতে যাবো...তুমি হাসছো কিন্তু সত্যি আমি এই কথাই বলেছিলাম।

—গা ছুঁয়ে বলো।

—মিথ্যে কথা আমি বলি না তুমি জানো।

—তা পুলিশ কি বললে?

—বললে, না। দেখা করতে পাবে না তুমি কারো সঙ্গে অগত্যা···

—চিঠি-পত্তরও লিখতে দেয় না?

—চেষ্টা করিনি।···যাকগে ও সব বাজে কথা, তারপর খবর কি সব বলো। তুমি কেমন আছো—শারীরিক, মানসিক!

—ভালোই। তুমি?

—আমি! আমি ভালোই আছি।

জেল সম্বন্ধে সুনন্দা ইতিপূর্বে অনেকের কাছে অনেক কথা শুনিয়াছে। একমাত্র সংসার কারাগারে বন্দিনী মা চপলাসুন্দরী ভিন্ন সে অন্য কাহারো মুখে জেলের প্রশংসা শুনিতে পায় নাই। সুতরাং কালীচরণের কথা সে একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারে না। বলে, খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

কালীচরণ একটু হাসিয়া বলে, খুব না, তবে সুখে নেই নিশ্চয়ই। জমাট একটা বেদনা হঠাৎ অন্তঃস্থল হইতে সুনন্দার কণ্ঠনালীতে ফেনাইয়া ওঠে। এত বড় একটা তীব্র অনুভূতি বোধ হয় আর কোনোদিন সুনন্দাকে অভিভূত করে নাই। সে কোনো কথা কয় না।

কালীচরণ সহজ ভাবে বলে, তারপর আর কি খবর সব বলো।

কাজ চলছে কেমন প্রতিষ্ঠানের? তোমার ওপর খুব চাপ পড়েছে, না?

সুনন্দা ইহার কি উত্তর দিবে। সজল চোখের দৃষ্টিটা ওর শুধু কালীচরণের মুখ ছুঁইয়া শানের মেজের উপর পিছলাইয়া পড়ে। কতখানি প্রত্যাশা করে কালীচরণ তাহার নিকট হইতে।

সুনন্দা বিব্রত হইয়া বলে, কাজ আমি কেন যেন করতে পারছি না একেবারেই!

—সে কি!

সুনন্দার মুখে কথা নাই। কি বলিবে সে, কেন কাজ করে না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কালীচরণ বলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না সুনন্দা।…এতদিন পরে দেখা হলো, কি কথা বলছো না শুধু চুপ করে আছ।…একটু যদি সহজ হতে তো আমার বলবার-কইবার অনেকটা সুবিধে হতো। তুমি জানো, খুব বেশিক্ষণ ধরে আমরা কথা কইতে পারবো না!

সহজ হইতে পারিলে সুনন্দাও কম সুখী হইত না। সাক্ষাৎ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তো অন্তত তাহার সেই সংকল্পই ছিল। এতক্ষণ কালীচরণের সহিত সে যে সমস্ত কথাবার্তা বলিয়াছে তাহার মধ্যে ইচ্ছা করিয়া সে তো কোথাও কোনো জটিলতার সৃষ্টি করে নাই। না কি বোধটাই তাহার জটিল! কথা বলিলেই বাঁকা-বাঁকা হইয়া শোনায়! সুনন্দা ভাবিয়া কূল পায় না, কি বলিবে।

—কি, কথা কইছ না কেন সুনন্দা ?

—সেই কাজের কথা বলছো ?

—হ্যাঁ, যে কোনো কথা। চুপ করে থাকার অবসরের এখানে তো আমার কোনো অভাব নেই!

অভাব সুনন্দারও নাই। এক হুঁ-না ভিন্ন সে-ও তো আজ কয়মাস হইল কাহারও সহিত কোনো কথা বলিতে পারে নাই। কিন্তু কে শুনিবে আজ তাহার সেই দুঃখের কথা।

ঢোক গিলিয়া সুনন্দা বলে, প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ে আমাকে অনর্থক মানুষের কথা শুনতে হয়।

—কি রকম ?

—তুমি হয়তো সব কথা বুঝবে না। আমাকে তো শুনতেই হয়, এমন কি তোমার নামেও তারা মিথ্যে রটনা করতে ইতস্তত করে না। আমি তা সইতে পারি না।

—অসহ্য হলে তো শুধু শত্রুই প্রবল হবে! করুণা করেও তো নিস্তার নেই। কাজ যে তোমাকে সেই সব লোকগুলোর ভেতরে থেকেই করতে হবে। হ্যাঁ, তা ছাড়া উপায় নেই।

—কিন্তু কি করে তা সম্ভব হয় বলো!

—বুঝি সুনন্দা। হতাশা আর ব্যর্থতায় মানুষের মন সব বিষিয়ে উঠেছে। তাই একজন অকারণে আর একজনের গায়ে বিষ ছিটিয়ে মিথ্যে শান্তি পেতে চায়! কিন্তু এ অসুস্থ অবস্থা কেটে যাবে। থাকবে না।

—হয়তো তাই-ই হবে।

—অবিশ্যি দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ মাথা আছে বলে মাথা ব্যথা। এর ভেতরে থেকেই তোমাকে আমাকে কাজ করতে হবে।

—কাজ করবার শক্তি তো সবার সমান থাকে না।

—সমান নিশ্চয়ই থাকে না কিন্তু এমন একটা মান আছে যার নিচে গেলে তুমি কাজই করতে পারবে না। আজকের দিনে অন্তত ক্ষমতার সেই সাধারণ মানটুকু তোমায় ঠিক রাখতেই হবে। করবে কি বলো, কাজ করতেই যখন নেমেছো!

—তবু কেন যেন উৎসাহ পাই না।

—শতনামপুরের মুখ চেয়েও না?

—অতটা হয়তো দৃষ্টিই নেই।

—আমি দিব্য দৃষ্টির কথা বলছি না।

—স্বর্গ দেখবার বাসনা আমার হতে যাবে কেন বলো? আমার দৃষ্টি আরও স্থূল।

—কি রকম! একটু সহজ করে বলো।

সুনন্দা অকুতোভয়। আজ সে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখিবে না। অনিরুদ্ধ আবেগ ঝন ঝন করিয়া ওঠে সুনন্দার কথায়, জানি তুমি আমায় এমনি করেই নিংড়ে নেবে—আমি চেয়েছিলাম তোমার দিকে। কিন্তু অনেক কাজের ফাঁকে এই

সামান্য কথাটুকু বোঝবার তো তোমার কোনো দিন অবসর হলো না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কালীচরণ বলে, বললে তুমি ব্যথা পেয়ো না সুনন্দা, আমার আদর্শের ওপর তোমার সে রকম অনুরাগ তো আমি কোনো দিন লক্ষ্য করিনি। যেটুকু দেখিয়েছ সেটুকু নেহাতই আমাকে হয়তো তোমার কোনো কারণে ভালো লাগে বলেই। কিন্তু মাথায় লাথি মেরে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করবার এই পদ্ধতিটা সত্যিই আমার খুব মর্মান্তিক ঠেকেছে। কথাটা হয়তো একটু কঠিন শোনালো কিন্তু আজ নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। এতটুকু আঘাত করার উদ্দেশ্যে আমি তোমায় এ কথা বলিনি।

সুনন্দা ধরা গলায় বলে, তোমার আদর্শের চাইতেও আমি তোমাকে বড় বলে মনে করেছিলাম কালীদা।

—এত বড় অসম্মান আমি অন্তত তোমার কাছ থেকে আশা করিনি।···দুবছর আগে তুমি ইতু-পূজো করতে। আমি বারণ করেছিলাম। কিন্তু সেই ইতু-পূজো ছেড়ে আমি তোমায় নিশ্চয়ই কোনোদিন মানুষ-পূজো করতে শেখাইনি।

—এর আগে তুমি তো আমায় কোনোদিন সে কথা খুলে বলনি। —তুমি তো জানতে চাও নি।···আমার আদর্শ যে আমার চাইতে কত বড়—তা যদি তুমি বুঝতে সুনন্দা!···তোমার চোখে আমি দেখেছি কেবল স্বপ্ন। দিনের আলোয় যা চিরকালই

অলীক—ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আদর্শের কথা বলছো, আদর্শের কথা জোর করে আমি তখন তোমায় কি বলতে যাবো বলো!

সুনন্দা একটু ম্লান হাসিয়া বলে, হয়তো স্বপ্নই হবে কিন্তু সে স্বপ্ন আমি তো তোমাকে নিয়েই গড়ে তুলেছিলাম।

—আমাকে নিয়ে তোমার সেই একান্ত স্বপ্ন সার্থক না-ও হয়ে উঠতে পারতো।

—ধর যদি মিথ্যেই হত।

—তখন আপসোসের আর সীমা থাকত না।

—সে দুঃখ আমি হাসিমুখে স্বীকার করতাম।

—হ্যাঁ, এড়াতে পারতে না বলেই তখন স্বীকার করে নিতে বাধ্য হতে। কিন্তু হাসিমুখে পারতে না। কোনো মানুষ তা পারেনি। ভুল বুঝে আর ভুল করে শুধু রক্তাক্ত হয়েছে।

—অবিশ্যি সব স্বপ্নই সত্যি হয় না।

—কিন্তু কেন, নিছক একটা স্বপ্নকে আশ্রয় করে দাঁড়াতে চাও কেন?

—স্বপ্ন মানুষের একটা থাকেই। তুমি যে আদর্শের কথা বলছো—আমি শুধু জানতে চাইছি—তাকে কি স্বপ্ন বললে ভুল করা হবে?

—বলতে পারো স্বপ্নই, কিন্তু শতনামপুরকে আশ্রয় করে আমার সে স্বপ্ন যে একান্তভাবেই জাগ্রত স্বপ্ন। সুস্থ, সবল, স্বাধীন শতনামপুর।

সুনন্দার মনে হয়, যেন ভাবী কালের সেই শতনামপুর আজ অতুল ঐশ্বর্য লইয়া কালীচরণের স্থির বিশ্বাসী দুইটি চোখের সম্মুখে ঝলমল করিতেছে।

কালীচরণ বলিয়া যায়, দেখনি তো তুমি এই জাগ্রত স্বপ্ন, সুনন্দা।

পাংশু হিমেল ঠোঁট দুইখানি সুনন্দার থরথর করিয়া কাঁপে। অন্তরের বাষ্পোচ্ছ্বাসে দুই চোখ ভরিয়া আসে।

সুনন্দার কোমল কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া যায় : না দেখিনি। কিন্তু তুমি চাও যে আমি আজও সেই দুঃস্বপ্নেরই জের টেনে চলবো আমার জীবনে? তোমার'পরে আমার প্রেম ভালোবাসার কোনো মানে হবে না, ব্যর্থ হয়ে যাবে সব কিছু!

কালীচরণের কণ্ঠস্বরও ভারী হইয়া আসে। সুনন্দার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলে, ব্যর্থ কেন হতে দেবে সুনন্দা! আজ সেই প্রেম তোমার আমার জীবনে সার্থক করে তোল।

গাঢ় কালো মেঘের নিচে বিদ্যুৎ স্ফুরণের অস্পষ্ট রক্তিমাভা সুনন্দার চোখে মুখে। অগ্নিবর্ণ দশটা আঙ্গুল সুনন্দার তারের জালতির দশটা ফাঁকে কাটিয়া বসে।

দূরে সঙ্গীনধারী সান্ত্রীর নাল লাগানো ভারী বুটের শব্দ শোনা যায়।

কালীচরণ বলিয়া যায়, আমার প্রেম আজ এর চাইতে বড় কোনো সান্ত্বনা তোমায় দিতে পারলো না।

সুনন্দার অন্তরতম কথা কয়টি আবার প্রাণের অঙ্গনে সারি দিয়া দাঁড়ায়। ঋজু সংযত কণ্ঠে সুনন্দা বলে, মানুষের মাঝখানে তোমার আদর্শকে জানবার দিক থেকে আজ হতে কোনো স্বার্থত্যাগকেই আমি আর বড় বলে মনে করবো না। এ তুমি স্থির জেনো। কিন্তু অনিশ্চিত কাল ধরে তুমি থাকবে এই অন্ধকারে, এ আমি কেমন করে সইবো, বলো।

করুণ হাসিয়া কালীচরণ বলে, যেমন করে সইবো আমি। গতানুগতিক সহজ পথে তো আমাদের যাত্রা নয়, সুনন্দা। বাধা বিঘ্নের ভেতর দিয়ে পথ কেটে-কেটেই আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। কিন্তু দেখবে, এই পথেই আবার আছে সান্ত্বনা। মনে হবে এত আনন্দ জীবনে আর কিছুতে নেই। তা যদি না থাকবে তো বলো আমিও তো মানুষ। কেমন করে আমি হাসি মুখে তোমায় বিদায় দিতে পারতাম।

সুনন্দা হঠাৎ চাপা একটা সপ্রগল্ভ উচ্ছ্বাসে উচ্ছল হইয়া ওঠে। হাসি-কান্না কিছুই বোঝা যায় না। বিম্বোষ্ঠের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে শুধু একটা সুতীব্র অন্তর্দাহ নীল হইয়া ফেনাইয়া ওঠে। বলি-বলি করিয়াও কি যেন বলা হয় না সুনন্দার।

নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে যথারীতি আসিয়া হাজির হয় ওয়ার্ডার। সময় হইয়া গিয়াছে।

উপরের তারের জানালার রন্ধ্রপথে সুতীক্ষ্ণ একটা সূর্যরশ্মি কারাকক্ষের ভিতরে আসিয়া পড়ে। বেলা যায়-যায়।

কালীচরণ নিরুত্তর। সুনন্দার মুখেও কথা নাই। অপলক চোখের স্থির দৃষ্টি সুনন্দার যেন ঐ আগ্নেয় তীরটাকে লক্ষ্য করিয়াই ছুটিয়াছে।

তেইশ

বাঞ্ছিত বস্তু নাগালের বাহিরে চলিয়া গেলে অনুশোচনা আসে, কষ্ট হয়। কিন্তু কয়েকটা চরমতম মুহূর্তকে কাটাইয়া উঠিয়া কোনোমতে সময়ের সূতায় জীবনের জেরটাকে গাঁথিয়া দিতে পারিলেই মন্দাক্রান্ত গতিতে আবার কিছুকাল চলিতে পারা যায়। প্রথমটা একটু কষ্ট হয়, কিন্তু পরে আর তাও থাকে না। সময়ের অবকাশে ভাঙ্গা মনেও নিপুণ ভাবে জোড়া লাগে; গভীর ক্ষতের উপরেও নূতন মাংসের পলি পড়িয়া ঘা শুকাইয়া যায়। বড় জোর থাকে দাগটা।

এ দাগে দাহ নাই; আছে শুধু দুঃখের মূর্ছনা আর সুখের গমকে ঠাসা জীবন সঙ্গীতের সুরেলা অনুরণন। কিন্তু মালিনীর সে অন্তর নাই। কোনো রকমে গোঁজামিল দিয়া এখন একটা ভারসাম্য খুঁজিয়া পাইলেই যেন সে বাঁচিয়া যাইবে।

ঝড়বাদলের পর রাঙ্গারোদে পিঠ দিয়া যেমন একটি পাখি ঠোঁট দিয়া গায়ের পালক ওলটায়, কলিকাতায় গোবর্ধনের বাসা-বাড়িতে আসিয়া মালিনীও ঠিক তেমনি একটু জুড়াইয়া লইতেছিল। প্রথমটা মন্দ লাগে নাই। গোবর্ধনের অকুণ্ঠিত

আন্তরিকতায় আর দুর্গার সশ্রদ্ধ সম্বর্ধনায় মালিনী মাঝে মাঝে রানীর আদরের স্বাদ পাইয়াছে।, এমন দিনও গিয়াছে যে হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে সোহাগে। কাঙ্গালিনী হইয়া অতখানি মর্যাদা সহ্য করিতে পারে নাই। দূর হইতে কালীচরণের দিকে কটাক্ষ হানিয়া গোবর্ধনের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছে, আপন পর কি গায়ে লেখা থাকে!

গায়ে লেখা থাকে না ঠিকই কিন্তু পর লোক বুঝি বড় আপনও হয় না। সাময়িক পরিতুষ্টিতে তৃপ্ত হ্যাংলা মন মালিনীর কয়েকটা দিন পরেই এ-সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া গিয়াছে। আর ধারে দুইটি জীবন বৃত্তান্ত লইয়া সহৃদয় আলোচনা হইলেই যদি পর লোক আপন হইয়া যাইত তাহা হইলে, সংসারে এত দুঃখভোগের আর কাহারো কোনো কারণ ঘটিত না।

সম্প্রীতি হয় দুই পক্ষেরই স্বার্থের খাতিরে। দুর্গা জুড়াইবে বলিয়াই মালিনীকে জুড়াইতে দিয়াছে। নয় তো নিজের জীবন জ্বালাইয়া দিয়া মালিনীর তাপিত চিত্ত শীতল করিবার আগ্রহ তাহার হইতেই পারিত না। এইখানে কানাকড়ি লইয়া টানাটানি চলে, এক ক্রান্তির এদিক ওদিক হইলে আগুন জ্বলিয়া উঠিলেও বিস্ময়ের অবকাশ থাকে না।

সুতরাং মালিনীর সম্পর্কে আন্তরিকতা দেখাইতে গিয়া দুর্গার প্রতি গোবর্ধন যদি করুণা করে সেক্ষেত্রে দুর্গার পক্ষ হইতে তাহার প্রাণান্তিক প্রতিবাদ ওঠা খুবই সঙ্গত। মালিনী না হয়

নিরপরাধই, কিন্তু দোষ না করিয়াও তাহাকে ঘটনাচক্রে দোষী সাজিয়া থাকিতে হয়। গোবর্ধনের বাঁসাবাড়ির শান্ত গৃহকোণে জ্বলিয়া ওঠে অন্তর্দ্বন্দ্বের আগুন। প্রথম অধ্যায়ের অনাবিল জীবন শেষে সংশয় আর অবিশ্বাসের পঙ্কিল আবর্তে পড়িয়া দুর্বিসহ হইয়া ওঠে। আবার চলো সেই শতনামপুর।

কলিকাতায় গোবর্ধনের মুখে কালীচরণের জেলে যাওয়ার সংবাদ শুনিয়া আহত পারাবতের মতো লাট খাইতে খাইতে মালিনী শতনামপুরে ফিরিয়া আসিল। সারা পথটা সান্ত্বনা দিতে দিতে সঙ্গে আসিল গোবর্ধন। চলন্তি ট্রেনে ধানক্ষেতের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া মালিনী অনেক কথাই চিন্তা করিল। এ চিন্তার কোনো বিশেষ ধারা নাই। ধানজলার উপর দিয়া বিশেষ একটা চিন্তার প্রবাহ চষামাঠের ঢেলায় ব্যহত হইয়া টেলিগ্রাফ তারের সূত্র ধরিয়া চলিয়া যায় কলিকাতায়— পরশু-দিন খাইতে বসিয়া দুর্গা তাহার সম্পর্কে ঐ কথাটা কোন অর্থে বলিল! দুর্গার কথার অর্থ তখনও যেমন বোঝা যায় নাই, এখনও তেমনি বোঝা যায় না। রহস্যের অন্ধকারে দুই-চারিটা ঠুল খাইয়া মন আবার ভিন্ন খাতে মোড় নেয় মালিনীর। সামনের দ্রুত অপসৃয়মান গাছপালা ঘরবাড়ির মতোই এক চিন্তা যায় আবার আর এক চিন্তা আসে। এ মিছিলের যেন

শেষ নাই। সারাটা পথ মালিনী যেন প্রকাণ্ড একটা উদ্বেগের কাঁধে চাপিয়াই শতনামপুরে ফিরিল।

নতুন বৌ আসিয়াছে শুনিয়া প্রথমেই আসেন চপলাসুন্দরী। সামান্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তল্লাটের যাবতীয় খবর মালিনীর নিকট অনর্গল আওড়াইয়া সিল্কের পাঞ্জাবি ধরিয়া টানিতে টানিতে গোবর্ধনকে নিজের ঘরে লইয়া যান। বলেন, ঘরের ভেতরটায় ঝাড়পোঁছ পড়ে একটু হাওয়া-বাতাস খেলতে থাকুক, ততক্ষণ আমার ঘরে বসে একটু গা জুড়িয়ে নেবে চলো। সারাদিনের ধকল।

জলখাবারের উদ্যোগ করিতে লাগিয়া যায় সুনন্দা। দুই হাতে কাজ করার ফাঁকে মিষ্টি হাসিয়া গোবর্ধনের সঙ্গে মস্‌করা করে। আর হরেকৃষ্ণ চায়ের দুধ সংগ্রহের উদ্দেশে পিতলের গেলাশ হাতে করিয়া ছুটিয়া বাহির হয় পাড়ায়।

লৌকিকতার খাতিরে বৈকুণ্ঠ লাহিড়ীও একবার খড়ম পায়ে দিয়া চক্কোত্তি-বাড়ির উঠানে আসিয়া দাঁড়ান। পায়চারি করিতে করিতে চারা আম গাছটার দিকে তাকাইয়া মালিনীকে শুনাইয়া বলেন, বাড়ি-ঘরে না থাকলে কি আর চলে! এই তো সব কত কি একেবারে সে দাঙ্গা হাঙ্গামা জেল হাজত! কি যে সব… তারা…তারা…তারা…

মিত্তিরদের বাড়ির রাঙ্গা-বউ একটু লাজুক ধরনের। ফিসফিস করিয়া ভিন্ন সচরাচর জোরে কথা বলে না। মুখে আঁচল

চাপা দিয়া চৌকাঠের ধার ঘেঁষিয়া শুধু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

কর্মব্যস্ত মালিনী ঝাঁটা দিয়া নোংরা তক্তপোষখানার উপর দুইটা বাড়ি দিয়া বলে, এখন আর কি কথা বলবো রাঙ্গা-বৌ, সময় করে দুপুরবেলা একবার আসিস—অনেক কথা আছে।

•

সুখ দুঃখের স্মৃতিবিজড়িত এই সেই শতনামপুর। কালো মাটির স্তরে স্তরে জীবনের কত ইতিবৃত্তই না চাপা পড়িয়া আছে।

ইচ্ছা থাকিলে মালিনী এখনও শান-বাঁধানো সিঁড়ির উপর বসিয়া দিনান্তে নারিকেল পাতার হিরণ্ময় ঝালরের দিকে তাকাইয়া আনমনা হইয়া যাইতে পারে। রান্নাঘরের জানালা দিয়া বাঁশবনের দিকে উঁকি দিয়া ন্যাজঝোলা কালো ফিঙের ফড়িং ধরিয়া খাওয়া দেখিতে পারে। হাসনুহানা ফুলের গন্ধে আকুল হইয়া এখনও হয়তো কোনো বিষধর বুকে ভর দিয়া ঢেঁকিশালের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। ইচ্ছা থাকিলে মালিনী এখনও পা টিপিয়া আগাইয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে পারে।

স্মরণের কোনো পৃষ্ঠাই স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয় নাই, তবু নতমস্তকে বুক দিয়া অনুভব করিবার মতো অনেক কিছুই আছে।

সেই রাস্তা, সেই মাঠ, সেই পথ, সেই ঘাট, নাই শুধু মনটা। কয়েকটা বৎসর পিছু হটিয়া গিয়া দুর্নিরীক্ষ্য ভবিষ্যতটাকে যদিও

বা আরও ক্ষুরধার করিয়া দেখা যায়, কয়েকটা বৎসর আগু বাড়িয়া গিয়া জীবনটাকে আর রসায়িত করিয়া তোলা বুঝি কিছুতেই সম্ভবপর নহে। মালিনী আর সে মালিনী নাই। সান্ত্বনার কথা যা বলিবার ছিল তাহা ইতিপূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং মালিনীকে শতনামপুরে পৌঁছাইয়া দিয়াই গোবর্ধন ফিরতি ট্রেনে কলিকাতা রওনা হয়। যাইবার সময় শুধু এই বলিয়া আশ্বাস দিয়া যায় যে, ভবিষ্যতে প্রয়োজন বোধ করিলেই যেন মালিনী হতভাগ্য গোবর্ধনকে স্মরণ করে। মালিনী হুঁ-না কোনো উত্তর করে না, নির্বিকার চিত্তে গোবর্ধনের যাত্রাপথ ধরিয়া শুধু কয়েক পা আগাইয়া যায়।

অদ্ভুত মানুষ এই গোবর্ধন। এক এক সময় মালিনীর হাসিই পায় লোকটার কথা ভাবিয়া। মনে হয়, প্রকাণ্ড একটা অপদার্থ উদ্ভট সব কামনা বাসনা লইয়া শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া পৃথিবীতে বাঁচিয়া চলিয়াছে।

চব্বিশ

ট্রেন ছাড়িয়া চলিয়া গেলে শতনামপুর স্টেশনকে যেমন বোবায় পাইয়া বসে, গোবর্ধনের চলিয়া যাওয়ার পর সমস্ত বাড়িটাও যেন ঐ রকমই ঝিমাইয়া পড়িল। অবশ্য গোবর্ধন সঙ্গে আসিয়াছে বলিয়া সমারোহ যে তেমন একটা কিছু হইয়াছে তাহা নহে, তবু সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ বাড়ি হইতে পাঁচটা লোকের আনাগোনার ফলে বাড়িটায় মানুষ বাস করে বলিয়া মনে হইয়াছে। এত দিন তো ছিল ভূতের বাড়ি। দিন দুপুরে ঘরের আড়ায় দোল খাইত চামচিকা, আর বারান্দায় কুকুরের মতো সপ্রতিভ ভাবে শুইয়া নিদ্রা যাইত শৃগাল।

অখণ্ড নীরবতার মাঝখানে ব্যথা বেদনার পুঁটুলি লইয়া জীবনের ক্ষেত্রফলটাকে গুটাইয়া বসা ছাড়া মালিনীর এখন আর কোনো কাজ নাই।

মালিনী জানে, ক্রমে এই পরিসরটা আরও ছোট হইয়া একটা বিন্দুতে আসিয়া ঠেকিবে। তারপর একদিন সেই বিন্দুও আর থাকিবে না; কাল তরঙ্গে ধুইয়া মুছিয়া যাইবে।

সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অগোছালো সংসার পুনরায়

গুছাইয়া বসিয়া জীবনযাত্রা প্রণালীর ছককাটা পাঠ যথারীতি আরম্ভ করিয়া দেওয়া মালিনীর সাধ্যে নাই। চাল আছে তো নুন নাই, নুন আছে তো তেল নাই—বুঝিয়া শুনিয়া চপলাসুন্দরী আসিয়া বলিয়া যান, একলার জন্যে আবার এসেই হাঁড়ি কাড়বি বউ, তার চাইতে আমিই বরং উনুন নেপে-পুঁছে ভেন্ন করে রাঁধি, একসঙ্গে খাসখ'ন। মাছ তো একরকম আমাদের হয়ই না।

একবেলা কোনোমতে দুইটি মুখে দিয়া তো পিত্ত রক্ষা করা—মালিনী কোনো আপত্তি করে না। হাসিয়া বলে, তার জন্যে আর কি, রাঁধবেন রাঁধুন। অনেক দিন আপনার হাতের নিরমিষ তরকারি খাইনি।

চপলাসুন্দরী ঠাট্টা করিয়া বলেন, জামাইবাড়ি থেকে ভালোমন্দ দেব্য খেয়ে এসে কি আর আমার তরকারির ঝোল এখন তোর ভালো লাগবে?

—কেন, ইস্! মনে মনে মালিনী বলে, সামান্য শাকভাত খাইয়া একটা মাদুর পাতিয়া পড়িয়া থাকিলেও হয়তো কিছুটা সোয়াস্তি পাওয়া যাইবে শতনামপুরে। ভালোমন্দ দ্রব্য খাইয়া যে সুখেই সে কলিকাতায় কাল কাটাইয়াছে মুখে আর তাহা অধিক কি জানাইবে।

মাথায় হাত নাচাইয়া তেল ঠাসিতে ঠাসিতে চপলাসুন্দরী সমবেদনার সুরে বলেন, করলি তো বউ এতক্ষণ যা হয়, চল্

এইবার গিয়ে নেয়ে আসি। আবার না হয় বিকেল বেলা ঝাড় পোঁছ করিসখ'ন।

—এই নোংরা আবার বিকেল বেলা ঠেলবো। আপনি বরং এগোন আমি হাতের কাজটুকু সেরে আসি। এগোন, ঘাটে থাকতে থাকতেই আমি আপনাকে ধরে ফেলছি।

ঘড়া কাঁকালে চপলাসুন্দরী হঠাৎ উচ্ছল হইয়া বলিয়া ওঠেন, নতুন বউ না হলে কি জমে। আমি তাই কত বলি: সুনী, একবার লিখে দে তোর জেঠিমাকে আমার জবানিতে, কলকাতা থেকে ফিরে আসুক, আবার কতদিন থাকবে জামাইবাড়ি! কথার মাঝে হঠাৎ ব্যথিতের সুরে চপলাসুন্দরী বলিয়া ওঠেন, আমারই হয়েছে সব চাইতে মুশকিল, বুঝলি নতুন বউ। জানিসই তার সে কী বলবো, যেমন তার তেমনি সাজা—দুটো কথা বলবার পর্যন্ত লোক পাইনে হাতড়ে। এক সুনী, তা সে মেয়ে তো দেখছই নিজের চোখে। দিনরাত ঐ চণ্ডীমণ্ডপ ঘর কামড়ে পড়ে আছে। কত লোকে কত কথা বলে। এখন, মানুষের মুখ তো আর তুমি ঠেকাতে পারো না। তারা তো ঐ করতেই আছে। মন্দ বই কোনোদিন ভালো বলবে না। তা মেয়ের যদি কোনো একটা ইয়ে থাকে। ঐ তো···মেয়ে সুনন্দার উদ্দেশ্যে চপলাসুন্দরী চণ্ডীমণ্ডপ-ঘরের দিকে চোখ দিয়া খোঁচা মারিয়া মুখ ঘুরাইয়া নেন।

—তা এ অসুখ আবার ধরলো কবে থেকে? একজন তো ঐ করে ডুবিয়ে রেখে গেছেন।

—বলে! সে কি মারামারি খুনোখুনি। ছিলি না—আমি তো বলি একপক্ষে ছিলি ভালো। আবার তো শুনছি চাষীরা নাকি সব দল গড়ছে নতুন করে। কি যে হবে!···তা তোর তো একটু কথাবার্তা যা হোক শোনে। বলিস দিকিন একবার বুঝিয়ে সুনীকে।

—ওরা সব নানা ভাবের ভাবী, আমার কথা কি আর গেরাহ্যি করবে।

—না করবে, তুই বলিস একবার।···কি যে যন্তনার মধ্যে আছি তা জানেন একমাত্তর গোবিন্দ।···আমার হয়েছে এখন ছুঁচো গেলবার অবস্থা, জানলি নতুন বউ। ওগরাতেও পারছি না, গিলতেও পারছি না। পার করা বললেই তো আর মেয়ে পার করা যায় না!

—সে তো সত্যি।

—কার কাছে বলি আর মনের কথা, নতুন বউ, ছাখ, আমার একার পক্ষে কি আর সব কিছু ব্যবস্থা করা সম্ভব। চপলা-সুন্দরী লাহিড়ীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া ওঠেন, এক আছেন উনি, তা সে নতুন করে কি বলব—সবই তো মায়ের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। এখন ছাখো কিছু বলতে গেলেই তো আমার সঙ্গে ঝগড়া লেগে যায়। এখন বলো···।

মালিনী কোনো কথা বলে না। সমব্যথীর ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া চপলাসুন্দরীর কথায় সায় দিয়া যায়।

হঠাৎ হুঁস ফিরিয়া আসে চপলাসুন্দরীর—স্নান করিতে যাইতেছিলেন। পিতলের ঘড়াটা কাঁকালে তুলিয়া বলেন, তো নে আর দেরি করব না। এ কাহিনীর তো বলে শেষ নেই। তুই আয় চট করে হাতের কাজ সেরে, আমি চললুম।

মোটের উপর মন্দ লাগে না মালিনীর চপলাসুন্দরীকে। নিজের কথা অবশ্য একটু বেশি বলে কিন্তু তাহা হইলেও বেশ হাসি খুশি আমুদে লোক, নিজে বাঁচিয়া পরকে বাঁচাইবার মন্ত্র জানে।

সুনন্দাই মালিনীকে আশ্চর্য করিয়াছে। সামান্য কয়টা মাসের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একটা মানুষ যে এতটা নূতন হইয়া যাইতে পারে, মালিনী তাহা কল্পনাও করে নাই। সমস্ত বাহুল্য চাপল্যকে আড়াল করিয়া কেমন একটা মন্থর ঋজুতা যেন ওর সমস্ত গতিবিধিটাকে সশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। হাসি নাই, কথা নাই, চণ্ডীমণ্ডপ-ঘরের মধ্যে কেমন রানী মাছির মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুনন্দা দিনরাত আপন মনে কাজ করিয়া যায়। মালিনী দেখে আর অবাক হয়।

মালিনীর সন্দিগ্ধ মন নয়কে হয় করিয়া অনেক কথা ভাবিয়া যায়। নির্বাক এই মননের পশ্চাতে সংশয়ের আঁধারিতে সুড় সুড় করিয়া আগাইয়া চলে একটা হিংসার কালসাপ। মারিলে

নড়ে না, তাড়াইলে যায় না, ঢেঁকিশালের বাস্তু-সাপটার মতোই এই কালসাপ মালিনীর পোষা হইয়া গিয়াছে। বলে না বলে না, একদিন হয়তো মালিনীকেই অতর্কিতে দংশিয়া বসিবে।

হাতের কাজটুকু শেষ করিয়াই মালিনীর স্নান করিতে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সুনন্দার সম্পর্কে কয়েকটা সংশয় যেন চকিতে তাহার সমস্ত চৈতন্য-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দাওয়ার উপর কয়েকটা মুহূর্ত ঝিম ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মালিনী তর তর করিয়া নামিয়া চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উঠিল। পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সুনন্দা নিবিষ্ট মনে কাগজে কলমে কি যেন একটা খসড়া করিতেছে। বহির্জগতের দিকে কোনো দৃকপাত নাই। কলমের সূচ্যগ্র মুখের মতোই অত্যুগ্র আগ্রহে পাতলা ঠোঁট দুইখানি টিপিয়া সরু হইয়া গিয়াছে।

মালিনী সুনন্দার এই একাগ্রতার উৎস খুঁজিয়া পায় না। কালো কালো চিন্তার পিছু পিছু ছুটিয়া শুধু সুস্থ শরীরকে অনর্থক ব্যস্ত করিয়া তোলে। সন্ধানী দৃষ্টি মালিনীর সমস্ত চণ্ডীমণ্ডপ-ঘরখানাকে বারকয়েক প্রদক্ষিণ করিয়া সুনন্দাকে অনুসরণ করে। আপাদমস্তক তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধানের পর মালিনীর মন পাগল হইয়া ঘরময় উড়িয়া বেড়ায়। কোথাও নিজের মতো করিয়া এতটুকু বসিবার ঠাঁই নাই। তুচ্ছ জিনিস-

গুলির উপরেও সুনন্দার সতর্ক আঙ্গুল যেন মালিনীকে চোর বলিয়া শাসাইয়া উঠিতেছে। এ নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ক্ষমতা তবে কি কালীচরণই দিয়া গেল সুনন্দাকে? মালিনী আর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে পারে না। ছুটিয়া গিয়া নিমেষে তক্তপোষের তলা হইতে একটা পুরাতন ষ্টিলের তোরঙ্গ টানিয়া বাহির করে।

সুনন্দা সচকিত হইয়া উঠিয়া বসে। বলে, কি হলো জেঠিমা?

—না, এই তোরঙ্গটা আমার দরকার।

—কেন? আরে ওর ভেতরে যে চাষী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের অনেক কাগজপত্তর রয়েছে।

—রয়েছে থাক না, তোরঙ্গটাই আমার দরকার।

কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ পুরাতন রঙচটা তোরঙ্গটার যে কি দরকার পড়িল, সুনন্দা তাহা ভাবিয়াও কূল পায় না। বলে, আচ্ছা প্রয়োজন একটু পরে নেবেন, দরকারী কাগজপত্তরগুলো আমি আগে বার করে নিই।

বার আবার করবে কি। যেমন আছে তেমনিই থাক। জেল থেকে ফিরে এসে আবার তো তার দরকার হবে!

সুনন্দা একটু বিব্রত হইয়া হাসিয়া বলে, হবে কি বলছেন, প্রতিষ্ঠানের কাজে কাগজপত্তরগুলো যে সব সময়ই দরকার হয়।

—নে তুই আর আমায় শিখোস নি সুনি। সব সময় আবার কাগজপত্রের কি দরকার হয়!

—কি কাণ্ড! তোরঙ্গটা নেবেন নিন, তা বলে···কি যে করেন জেঠিমা! বুঝছেন না যে ওগুলো অত্যন্ত দরকারী! সুনন্দা মালিনীর আচরণে বিরক্ত বোধ করে।

মালিনী ত্রস্তে কাগজের ফাইল আর খাতাপত্রগুলি সব মাটিতে বিক্ষিপ্তভাবে নামাইয়া রাখিয়া বাক্সটা উপুড় করিয়া ফেলিয়া ময়লা ঝাড়িতে লাগিয়া যায়। বলে, অযত্নে পড়ে থেকে আমার কতদিনকার তোরঙ্গটা মরচে ধরে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। কাগজ পত্তর না সব আমার পিণ্ডি চটকে রাখা হয়েছে ভেতরে। নেবার সময়ই আমি বললুম কত কত কোরে যে, নিও না আমার তোরঙ্গটা।

লোকসানের আক্ষেপ ঝন্ ঝন্ করিয়া ওঠে মালিনীর কণ্ঠে।

সুনন্দার ব্যাপারটা নিতান্তই পারিবারিক বলিয়া মনে হয়। কাহার তোরঙ্গ কে যে কবে এখানে জোর করিয়া লইয়া আসিয়াছিল, সুনন্দার তাহা একেবারেই জানা নাই, জানিবার কৌতূহলও নাই। বিব্রত অবস্থায় সুনন্দা শুধু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাগজপত্রগুলি একজায়গায় জড়ো করিয়া গুছাইয়া রাখে। মানুষের এ-হেন দুর্বোধ্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণের বিরুদ্ধে চট করিয়া কি বলিতে যাইবে সে!

একদৃষ্টে তোরঙ্গটার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া মালিনী আপন মনেই বলিয়া ওঠে, না, এ যে দেখি একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। থাকগে পড়ে যেমন আছে।

কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মালিনী হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে চণ্ডীমণ্ডপ-ঘর হইতে একরকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া যায়।

সুনন্দার মুখে কথা নাই। মালিনী তাহাকে একেবারে হতবাক করিয়া ছাড়িয়াছে। বাক্সের ডালাটা এক হাতে উঁচু করিয়া ধরিয়া সুনন্দা কিছুক্ষণ ঠায় চুপ করিয়া থাকে।

আর মালিনী—ঠাকুরঝি পুকুর হইতে কোনোমতে একটা ডুব দিয়া আসিয়া সেই যে ঘরে খিল আঁটিয়া শুইয়া পড়ে, হাজার হাঁক-ডাক করিয়াও তাহার আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। কত সাধ্য-সাধনা, কত অনুনয়। মালিনী কিছুতেই দুয়ার খুলিবে না। অবশেষে আসেন চপলাসুন্দরী। সুনন্দার মুখে তোরঙ্গ ঘটিত ইতিবৃত্তান্ত শুনিয়া দ্বিধাকম্পিত ত্রস্ত পদক্ষেপে কাপড়ে হাত মুছিতে মুছিতে চক্কোত্তিবাড়ির বড় ঘরের বারান্দায় গিয়া ওঠেন। তারপর রুদ্ধ দুয়ারের উপর কয়েকটা ধাক্কা মারিয়া ডাকেন, নতুন বৌ, ও নতুন বৌ, নতুন বৌ!

কোনো উত্তর নাই।

চপলাসুন্দরী একবার ভাবেন, ফিরিয়া যান। দরকার কি অত আদিখ্যেতার ধার ধারিয়া; গরজে আপনিই দুয়ার খুলিয়া ভাব জমাইতে আসিবে। আবার ভাবেন, মানুষটা স্রেফ না খাইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া পড়িয়া থাকিবে সারাটা দিন, অথচ কেহ একটা কথা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না, তাহাই বা

কেমন দেখায়। আর কি বলিতে হঠাৎ কি বলিয়া বসিয়াছে সুনন্দা নতুন বৌকে তাহারই বা ঠিক কি! কথা বলার যা ছিরি হইয়াছে মেয়ের দিনে দিনে! বিপদেই পড়েন চপলাসুন্দরী। এখন নতুন বৌকে আবার ডাকিতে গিয়া যাচিয়া অপমান কাঁধে তুলিয়া নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হইবে, না, আপনা হইতেই পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত আগুন জ্বলিয়া যাইতে দেওয়াই সমীচীন হইবে—চপলাসুন্দরী তাহা স্থির করিতে পারেন না।

একটু ইতস্তত করিয়া চপলাসুন্দরী রুদ্ধ দুয়ারের জোড়ের মুখে নিজের কানটা চাপিয়া ধরেন। যদি কিছু সাড়া শব্দ পান তো সেই সূত্রে আবার কয়েকটা ডাক দিয়া চলিয়া যাইবেন আর কি। তাহা হইলে পরে আর নতুন বৌ ঘুমাইয়া পড়িবার দরুন ডাক শুনিতে পায় নাই—এই অজুহাত তুলি ত সাহস করিবে না।

হঠাৎ দরজায় খট্ করিয়া একটা শব্দ হইতেই চপলাসুন্দরী একটু বিব্রত হইয়া সরিয়া দাঁড়ান। দেখেন, ত্রস্তে খিল খুলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া যাইতেছে মিত্তিরদের বাড়ির রাঙ্গা-বউ সরমা—ছোবল দিবার পর ঠিক সাপ যেমন করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায় ঠিক তেমনি।

চপলাসুন্দরী একটু ইতস্তত করিয়া মালিনীকে একটা ডাক দেন, নতুন বৌ!

বাকি কথাটুকু বলার অবসর না দিয়াই মালিনী বলিয়া ওঠে, শরীরটা ভালো লাগছে না দিদি, আমার জন্যে বোসে না থেকে আপনারা বরং খেয়ে নিন গিয়ে। আমি আজ কিছু খাব না।

আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা—মালিনী একবার ফিরিয়াও তাকায় না চপলাসুন্দরীর দিকে।

বিষক্রিয়া হয়তো আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ততক্ষণে।

পঁচিশ

চোপর রাত দাঁতে দাঁত লাগিয়া পড়িয়া থাকিয়া মালিনী পরদিন সকাল বেলা বিছানার উপর উঠিয়া বসে। সমস্ত শরীরে স্যাঁতসেতে একটা ভারী বেদনাবোধ—ভিজে পাঁউরুটির মতোই. গায়ের মাংসগুলি যেন হাড় হইতে আলগা হইয়া পড়িয়াছে। আর মাথাটার তো ঠিকানাই নাই; সারাক্ষণ ঝিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌রিম্‌ —মাতালের মতো বারবার টলিয়া-টলিয়া যাইতেছে। শরীর দুর্বল, অস্থির প্রাণ যেন হুতাশের আগে ক্ষীণ দীপশিখার মতোই অহরহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। হঠাৎ যদি নিভিয়াই যায় তাহা হইলেও আশ্চর্যের কিছুই থাকিবে না।

সুনন্দা সারা রাত জাগিয়া মালিনীর মাথায় [illegible] বাতাস করিয়াছে। অচৈতন্য মালিনীর শারীরিক আক্ষেপের প্রতিটি লক্ষণ ধরিয়া এই চিত্ত-বিভাবনার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছে। কিন্তু সঠিক কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। আবর্তসঙ্কুল খরতোয়া নদীর তরঙ্গাঘাতে নিঃসঙ্গ এক জেলে ডিঙ্গির মাল্লার মতোই নাকাল হইয়াছে। দুইখানি ঐ সরু সরু হাতে মালিনী যে এতটা শক্তি ধরে—সুনন্দা তাহা ভাবিতেও পারে নাই।

শুশ্রূষা সুনন্দা অনেক করিয়াছে। রাতের পর রাত শিয়রে জাগিয়া বসিয়া অনেক জটিল রোগীর কূটলক্ষণগুলির কার্যকারণ বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়াছে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত মালিনীর বাহ্যিক আক্ষেপের অনেকগুলি ভঙ্গীই তাহার কাছে অতি অদ্ভুত ঠেকিল। একটা মানুষ যে একটা মনপ্রাণ লইয়া একই সময়ে বিভিন্ন ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িতে পারে, সুনন্দা তাহা এই নূতন দেখিল। এই কান্না, এই হাসি—এই ক্রোধ, এই অনুশোচনা—এই করুণা, এই বিরক্তি—সে একটা বীভৎস দৃশ্য। গোটা মানুষটার অন্তরের সমস্ত রঙ রূপ রস যেন প্রতি-মুহূর্তে নিষ্ঠুর ঝলকে ঝলকে বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রাণবস্তুর এই নিদারুণ অপচয় চোখ মেলিয়া সহ্য করা যায় না। সারা দেহমন যেন দারুন একটা অস্বস্তিতে হাঁপাইয়া ওঠে।

একলা মালিনী থাকে ভালো। ঢিলে ঢিলে চোখ মুখ লইয়া গা হাত পা ছাড়া ভাবে কোনো তুচ্ছ সামগ্রীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কোনো সময় হয়তো কিছু ভাবে, আবার হয়তো ভাবেও না। চিত্তবিক্ষেপের কারণ ঘটে যেন মানুষ দেখিলেই। চোখ মুখের হাবে ভাবে এই অস্বস্তিটা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

চপলাসুন্দরী নেহাত প্রয়োজন ব্যতিরেকে ঘরে ঢুকিতে ভরসা পান না। দূর হইতেই তদবির তদারক করিয়া খোঁজ খবর লইয়া যান। অসুস্থ মানুষের সহিত যুক্তিবোধের কথা তুলিয়া অনর্থক

বিপদাপন্ন হইয়া লাভ কি? কি বলিতে গিয়া ঝিয়া আবার যে একটা হৈ চৈ-এর সৃষ্টি করিয়া বসিবে না, তাহা কে বলিতে পারে! ভাবে ভাব দিয়া চলিয়া এখন একটু ধাতস্থ করিয়া তুলিতে পারিলেই যথেষ্ট করা হইবে। চপলাসুন্দরী জানেন, ঔষধ অপেক্ষা এখন নিক্তির ওজনে মাপিয়া সহৃদয় তুইটা কথাবার্তা হইলেই কার্যকরী হইবে বেশি।

বিছানার উপর আপন মনেই কিছুক্ষণ ঝিম করিয়া বসিয়া থাকিয়া মালিনী আস্তে আস্তে ত্ব-এক পা করিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়ায়। চোখ মুখের কেমন যেন একটা উদাস উদাস ভাব—বাহ্যেন্দ্রিয়ের পশ্চাতে মননের যন্ত্রটি যেন একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি চিরপরিচিত পরিবেশটাকে যেন আজ আবার নূতন করিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে।

খানিকক্ষণ কাটিয়া যায়। নিস্তব্ধ ঘরবাড়ি, গাছপালা মনে হয় যেন স্বপ্নময়, তন্দ্রালু। চরাচরের মনেরও ঠিকানা নাই যেন। নিশিডাকা ঘুমন্ত মানুষের মতো মালিনী হঠাৎ আবার লঘু পদ-ক্ষেপে চণ্ডীমণ্ডপ-ঘরের দিকে আগাইয়া যায়। চোরের মতো সভয়ে আড়ি পাতিয়া আশপাশ হইতে ঘরের ভিতরটা নিরীক্ষণ করে। দেখে সুনন্দাকে—অবিরাম কর্ম-প্রবাহের মাঝখানে ডুবিয়া বসিয়া চোখেমুখে রক্তিম প্রাণোচ্ছ্বাসের অগুরু-চন্দন লেপিয়া দিয়াছে। কত লোক, কত বার্তা—অনাগত বলিষ্ঠ

শতনামপুরের আহ্বানে যেন মুখর হইয়া উঠিয়াছে চাষী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান।

খিওরের চরে আজ রাত হইতে নাকি আবার কোদাল পড়িবে। উত্তেজনা মালিনীর সহ্য হয় না। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া কপাল দিয়া ঘাম ছোটে। আস্তে আস্তে চণ্ডীমণ্ডপ-ঘরের পাশ কাটাইয়া মালিনী দুই এক পা করিয়া মিস্তিরবাড়ির দিকে আগাইয়া যায়। ভিজে সর্পিল পথের বুকে দ্বিধা-কম্পিত প্রতি পদক্ষেপে মালিনী যেন সব সময়ই একটা ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলে। নতমুখে দুই হাতে পরনের কাপড়টা টিপিয়া ধরিয়া আগু-পিছু করিয়া ছোট ছোট পায়ে এমনভাবে হাঁটে মালিনী যে, দেখিলে অদ্ভুত ঠেকে। মনে হয় পথের ধূলায় পড়িয়া কি যেন একটা হারাইয়া গিয়াছে, মালিনী কিছুতে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

মিস্তিরবাড়ির পথ গোরাচাঁদের আখড়ার রাস্তা ছুঁইয়া ডাইনে মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে। দুই পথের দুই ইতিহাস যেন হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে এই চৌমাথাটায়। কি মনে করিয়া যেন মালিনী আখড়ার পথ ধরে। রাধাগোবিন্দদেবের তোরণ-দ্বার পার হইয়া কুঞ্জগলির ভিতর দিয়া পদ্মাবতীর ঘরের দিকে আগাইয়া যায়। মালিনী জানে পদ্মাবতী বৃন্দাবনবাসিনী হইয়াছে, তবু ঘরের ভিতরটায় একনজর তাকাইবার কৌতূহল সে কিছুতেই দমন করিতে পারে না।

পদ্মাবতীর ঘরের দক্ষিণ দিকে রাধাগোবিন্দের আঙ্গিনা। আগেকার দিনে কত লোকই না এখানে প্রেমানন্দে গড়াগড়ি খাইত! ভক্তিগদগদ চিত্তে পুত অঙ্গনের পাতলা ধূলা দুই হাতে মাথায় তুলিয়া নাম-সংকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্ববাহু হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিত। জনসমাগম না থাকায় সারা আঙ্গিনাটা এখন কাঁটানটে আর বিন্না ঘাসে ছাইয়া গিয়াছে। বেদীর উপর অযত্নরক্ষিত রাধাগোবিন্দদেবের অঙ্গেও কালী পড়িয়াছে। ধূলিমলিন দেবদেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে যেন একটা ধূসর রুক্ষতা। দুইটি নীল নয়নে এখন আর সেই বরাভয়ের আশ্বাস নাই। মুখের শুভ্র হাসিটি গোপন করিয়া দেবতা যেন অতি দুঃখে আখড়াটার উপর নিষ্ঠুর কটাক্ষ করিয়া আছে।

ছত্রভঙ্গ সংগঠনের এলোমেলো জিনিসপত্রের উপর দিয়া প্রেতিনীর মতো লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া হাঁটিয়া যাইতে মালিনীর বেশ লাগে। ইচ্ছা করে দুই হাতে সব জঞ্জাল তুলিয়া সারা বিশ্বসংসারের উপর এমনি করিয়াই ছিটাইয়া দেয়। পৃথিবীতে মানুষের হাতে গড়া সমস্ত শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য নিষ্ঠুর আঘাতে ভণ্ডুল করিয়া দিয়া পদ্মাবতীর মতোই নিরুদ্দেশ হইয়া যায়।

গোটা আখড়াটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া মালিনী কুঞ্জগলির আবছায়ে পদ্মাবতীর ঘরের বারান্দায় গিয়া বসে। তারপর কোমরের গাঁটছড়া হইতে কালীচরণের কুশপুত্তলিকাটি খুলিয়া টুকরা টুকরা নখে দাঁতে ছিঁড়িয়া পদ্মাবতীর নামে

মাটিতে ছড়াইয়া দেয়। একটু কাঁদে, একটু হাসে। তারপর আকাশের দিকে মুখ করিয়া বিধাতার গায়ে বারকয়েক থুথু ছিটকাইয়া আবার পথ চলিতে শুরু করে।

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া যায় যায়। তুরন্ত ফাল্গুন ধূলিঝঞ্ঝার আঁচল ধরিয়া রোদপোড়া মাঠের বুকে মাথা কোটাকুটি করিতেছে। এ-পথ সে-পথ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মালিনী শেষে ঠাকুরঝি পুকুরের পাড়ে আসিয়া দাঁড়ায়। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নাই। ঝিমরিম ঝিমরিম—ঠাকুরঝি পুকুরের কালো জলরাশিকে ঘিরিয়া স্থাবর জঙ্গম যেন তন্দ্রাহত হইয়া আছে। মালিনীর ইচ্ছা করে এই ফাঁকে তুই কানে আঙ্গুল চাপিয়া টুপ করিয়া ঐ কালো জলের গহীনে চিরতরে তলাইয়া যায়।

কপাল ভাঙ্গিয়া শতনামপুরে আসার প্রথম দিনটি হইতেই কালো জলের ঠাকুরঝি মেয়ে তাহাকে কতবার না হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছে। মালিনী সাড়া দেয় নাই। ব্যর্থ অনুরাগে বারবার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু আজ আর তাহার বুঝি কোথাও ফিরিবার ঠাঁই নাই। কালো জলের গহীনে ঠাকুরঝি মেয়ের হাতে পরিপাটি করিয়া পাতা শীতল পঙ্কশয্যাতেই এবার বুঝি তাহাকে আশ্রয় লইতে হয়।

ঝিম ধরা কালো জলের মতোই মালিনী স্থির—অচঞ্চল।

জলভরা তুই চোখের সামনে হঠাৎ যেন [illegible] হইতে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়ায় বিচিত্রবর্ণের একটা ছোট্ট চাঁদা মাছ—কালো জলের ঠাকুরঝি মেয়ের সোনার হরিণ। মালিনী লঘু পদক্ষেপে ঘাটের তুই তিনটা ধাপ নামিয়া গেলেই ঠাকুরঝি মেয়ের হাতের তুহীন স্পর্শ। মালিনীর পায়ের তলা হইতে হঠাৎ একটা মৃত্থ কম্পন উঠিয়া সারা দেহে ছড়াইয়া পড়ে। মনে হয় যেন অনেকগুলি ছোট গুগলি শামুক তাহার গা বাহিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্বপ্নচালিতের মতো আরও তুই তিনটি ধাপ নামিয়া গিয়া ঠাণ্ডা জলে পা দিতেই মালিনী আচম্‌কা চোখ রগড়াইয়া বিস্ময়ের ভঙ্গীতে চারিদিক নিরীক্ষণ করে। দেখে, ও পারের স্থাবর জঙ্গম দক্ষিণ বাতাসের দোলা খাইয়া ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছে। বুনোলতার মঞ্জরীর বৃন্তগুলি থাকিয়া থাকিয়া নিবিড় আবেশে পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিতেছে। প্রকৃতির এই প্রাণোৎসবের বাসরে মরণের ইঙ্গিত তো কোথাও নাই। মালিনীর যেন মনে হয়, ওপারের ঐ কচুর পাতাগুলি পর্যন্ত অবিরাম মাথা নাড়িয়া না না বলিয়া তাহাকে শত অনুনয়ে এই নিষ্ঠুর প্রতিশোধ গ্রহণে নিরস্ত করার প্রয়াস পাইতেছে। এ উপরোধ পায়ে ঠেলা যায় না। দেহ মনের সবটুকু শক্তি একত্র করিয়া মালিনী ত্রস্ত পায়ে ঘাটের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া আসে। তারপর যেন ভয় পাইয়াই ঠাকুরঝি পুকুর ঘাট হইতে ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

চোরের মতো ভীরু পদক্ষেপে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলিয়া মালিনী শুইবার ঘরের দাওয়ার কোণ ঘেঁষিয়া ঘরে গিয়া ওঠে। তারপর নিঃশব্দে দরজায় খিল আঁটিয়া দিয়া শুইয়া পড়ে।

রান্নাঘরের ভিতরে উনুনের মুখে ছিটে কঞ্চির জ্বাল ঠেলিয়া তেঁতুল পোড়া দিয়া ভাতের শেষ গ্রাসটি মুখে পুরিয়া চপলাসুন্দরী আড়চোখে মালিনীর এই পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া লক্ষ্য করেন। কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। কোঁৎ করিয়া ঢোক গিলিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে দেখেন, দরজাটা নড়ে কি না। তারপর উতলানো দুধ হাতা কাটিয়া সামলাইয়া রসাইয়া রসাইয়া আঙুল চাটেন। একবার ভাবেন, নতুন বৌ সম্পর্কে এতখানি নিস্পৃহ ভাব ঠিক ধর্মসঙ্গত হইতেছে না। উপর-ওয়ালাকে এজন্য নিশ্চয় তাঁহাকে একদিন জবাবদিহি করিতে হইবে। আবার ভাবেন, স্বেচ্ছায় নতুন বৌ স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিলে ধর্মত তাঁহার অপরাধ কোথায়! জোর করিয়া তো এখন তিনি আর নতুন বৌয়ের মতিগতি ফিরাইতে পারেন না। মনটা কিন্তু তবু ছটফট করিতে থাকে চপলাসুন্দরীর। অদৃশ্য-কলমের তুচ্ছ একটি খোঁচায় অদৃষ্ট যে কোন দিক দিয়া কতখানি বানচাল হইয়া যাইতে পারে, সামান্য মানুষ হইয়া তিনি তাহার কি বুঝিবেন। বিশেষ লাহিড়ীর শরীরটা আবার ইদানীং ভালো যাইতেছে না। সাত পাঁচ ভাবিয়া চপলাসুন্দরী সকড়ি হাতেই পা টান করিয়া ফেলিতে ফেলিতে চক্কোত্তিবাড়ির আটচালায়

গিয়া ওঠেন। অন্তরঙ্গ হইয়া মিঠে সুরে ডাকেন, নতুন বৌ, বলি অ নতুন বৌ, নতুন বৌ ঘরে আছিস নাকি লো!

কোনো উত্তর নাই।

নতুন বৌ!

খিট করিয়া ছিটকিনি খোলার শব্দ পাওয়া যায়। একমাথা বিস্রস্ত রুক্ষ চুল লইয়া মালিনী ত্রস্তে জানালাটার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। পাংশু বিবর্ণ মুখখানির উপর ভাষাহীন বড় বড় চোখ দুইটি কিছুক্ষণের জন্য চপলাসুন্দরীর মুখের উপর স্থির হইয়া থাকে। কথা জোয়ায় মুখে আরও পরে। খোসার মতো পাতলা দুইখানি ফ্যাকাসে ঠোঁট ঈষৎ নাড়িয়া মালিনী ক্লান্ত নম্রকণ্ঠে বলে, কিছু বলছিলেন আমায় দিদি!

ভাবভঙ্গী দেখিয়া চপলাসুন্দরীর মুখে কথা সরে না। বক্তব্য ভুলিয়া মালিনীর মুখের দিকে শুধু নির্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকেন। শেষ পর্যন্ত ক্ষেপিয়া যাইবে নাকি নতুন বৌ! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া স্নেহের সুরে বলেন, আচ্ছা কিরকম ধারা মানুষ তুই নতুন বৌ একবার বোঝ, যে শরীরের এই অবস্থা, উঠতে গিয়ে ঘুরে পড়ে যাস, আর নাওয়া নেই—খাওয়া নেই, এই নিয়ে তুই অক্লেশে এ-পাড়া ও-পাড়া করে বেড়াচ্ছিস। আমি তো এদিকে না দেখে সেনের বাড়ি মিত্তিরবাড়ি রাজ্যি খুঁজে তন্ন তন্ন করছি।···কি হয়েছে বল দেখি তুই একবার আমায় খুলে—সত্যি করে বল।

বলিবার মতো হইলে নিশ্চয়ই আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু সব কথাই কি বলা যায়। এমনিও তো কথা আছে যে, কানে শুনিয়া শেষ পর্যন্ত নিজের কাছেই নিজে চোর হইয়া থাকিতে হয়।

করুণ হাসিয়া মালিনী বলে, বলবার কি আছে, এমনই।

সুনি হয়তো তোর খোঁজেই আবার মিত্তিরবাড়ি বেরিয়ে গেল।

কেন এত খোঁজাখুঁজির কি আছে! বিরক্তির ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে মালিনীর চোখে মুখে।

কেন কি, ভাবনা হয় না! তোর জন্যে সুনি দেখি একেবারে সে কি রকম করে!

কি রকম করে?

থতমত খাইয়া যান চপলাসুন্দরী মালিনীর কথায়। কি করিয়া বুঝাইবেন তিনি—কি রকম করে সুনি নতুনবৌয়ের জন্যে।

মালিনী বলিয়া যায়, করবার আগ্রহ সকলেরই আছে, আমারই শুধু থেমে আসছে।

চপলাসুন্দরী মালিনীর মনের কোনো হদিস পান না। বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করিয়া কিছুক্ষণ মালিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সুনন্দাকে ডাকিবার ছুতা করিয়া আগ-দুয়ার দিয়া ঘুরিয়া নিজের ঘরে গিয়া ওঠেন। সাধ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথার খোঁচা খাইয়া বিব্রত হইবার দরকার কি! তিনি

কাহারো খান, না পরেন, যে হাসি মুখে যাহার ইচ্ছা তাহার বাঁকা কথা সহ্য করিতে যাইবেন !

সুনন্দার আজ এতটুকু অবসর নাই। দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের পর শতনামপুরের অধিবাসীদের ভাঙ্গা দেহমনে আবার ঋজুতা ফিরাইয়া আনিয়াছে। চর-কাসুন্দি মৌজার শত শত ভগীরথ ঘিওরের চরে খাল কাটিয়া সুজা নদীর সুরধুনী বহাইয়া দিবে বলিয়া বদ্ধপরিকর। জনপদের প্রাণচাঞ্চল্য আজ একটি শুভ দীপ-শিখার মতোই সুনন্দার প্রাণের বাসরে অনির্বান জ্বলে। এ প্রদীপ নিভিতে দিতে নাই। তবু দমকা হাওয়ার ঝাপটার মতোই মাঝে মাঝে মালিনীর দীর্ঘশ্বাস নিভৃত এই দীপ-শিখাটিকে বিব্রত করিয়া তোলে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল ঘিওরের চরের আকাশে উড়ন্ত কালো মেঘের মতোই মালিনী সুনন্দার মনের আঙ্গিনায় সংশয়ের কালো ছায়া ফেলিয়া যায়। সুনন্দা কেমন যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়ে—ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

মিত্তিরবাড়ি হইয়া সেনেদের বাড়ির উপর দিয়া একটা পাক দিয়া আসিয়া সুনন্দা এক রকম জোর করিয়াই মালিনীকে বিছানা হইতে ঠেলিয়া তোলে। সই সরমাও মালিনীর হাত ধরিয়া টানা টানি করিয়া কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে কৈফিয়ৎ তলব করে, কেন কি হয়েছে তোর একবার খুলে বলবি তো! ওঠ নাওয়া খাওয়া কর।

বিস্বাদ যাহার অরুচি ধরাইয়া দিয়াছে জীবনে, খাওয়া-দাওয়ার উপর তাহার আসক্তি থাকে কি করিয়া! স্বপ্নালু চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া মালিনী ক্ষোভের সুরে ক্ষীণকণ্ঠে বলে, আমাকে তোমরা একটু একলা থাকতেও দেবে না। কেন, কি করেছি আমি তোমাদের! কাল সারারাত আমি এতটুকু ঘুমুইনি তোমরা জানো!

অবরুদ্ধ আবেগ কন্‌কন্ ঝন্‌ঝন্ করিয়া ওঠে মালিনীর শেষ কথা কয়টিতে। কেমন যেন একটা আক্রোশভরা স্বাতন্ত্রাভিমান মালিনীর কথার সুরে কাঁপিয়া ফুঁসিয়া ওঠে।

এই সুরকে সুনন্দা ভয় করে। সুনন্দা জানে যে, এই রকম আর দুই একটা কথার প্রশ্রয় পাইলেই গত রাতের মতো অনিবার্য-ভাবে ঝড় উঠিয়া আসিবে মালিনীর সারা দেহ মনে। ত্রস্তে মালিনীর গায়ে পিঠে হাত বুলাইয়া সুনন্দা কোমলকণ্ঠে বলে, আচ্ছা, ঘুমুবে তো ঘুমোও না জেঠি-মা তুমি, ঘুমোও। ছি··· ঘুমোও। আমরা যাচ্ছি।···এই তো আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, তুমি একলা চুপ করে ঘুমোও।

নিঃশব্দে বিছানার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া সুনন্দা সরমাকে একান্তে ডাকিয়া একটু ভীতভাবে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলে, সরমাদি, তুই এখানে একটু থাকিস। আমি দেখি চট করে যদি খানিকটা গরম দুধ আনতে পারি!

ছাখ, যদি পাস!

চৌকাঠ পার হইতে না হইতেই সরমা পিছন হইতে বলিয়া ওঠে, সুনি শোন!

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। বিষয়টা ফিরিয়া শুনিয়া বুঝিবার আর কোনো অবকাশ থাকে না। সরমার আঙুলের ইসারা ধরিয়া সুনন্দা দেখিতে পায়, মালিনীর বুকটা ততক্ষণে দারুণ আক্ষেপে ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠানামা করিতেছে।

সরমার মুখে কথা নাই। আস্তে আস্তে দু-এক পা করিয়া মালিনীর শিয়রের কাছে আগাইয়া গিয়া সুনন্দা অস্ফুটে বলে, কোনো একটা কিছুতে করে খানিকটা জল নিয়ে আয় তো সরমাদি।...আবার ফিট হল।

সরমার আর বাড়ি ফিরিয়া যাওয়া হয় না। পুরুষের মতো লম্বা শক্ত হাতে হাতপাখার ডাঁটিটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া সরমা শুধু হাওয়া করিয়া চলে। ঘোমটার আড়ালে মুখখানা দেখিয়া মনে হয় সরমার...নির্বিকার, হাসি-হাসি। কিছুদিন আগে স্বামী ধীরেশ সেনের মরণাপন্ন অসুখের সময়েও সরমাকে ঠিক এই একই ভাবে রাতের পর রাত শিয়রে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। সমূহ সর্বনাশের আশঙ্কায় বাড়ির অন্য সকলে কাঁদিয়া আকুল হইলেও সরমার চোখ দিয়া কেহ এক ফোঁটা জল পড়িতে দেখে নাই। সরমা কাঁদে নাই বলিয়া শেষকালে শাশুড়ির সে কত না গঞ্জনা—স্বামীর মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়া সরমার শাশুড়ি সরমাকে নাকি হাসিতে

দেখিয়াছেন। হইবেও বা।...সজ্ঞানে ফিরিয়া আসিতে মালিনীর বেলা পড়িয়া যায়। বৈকাল বেলার দিকে চোখ খুলিয়া চারিদিকে অপরিচিতের ভঙ্গীতে তাকাইয়া বলে, এখন কি, সকাল না বিকেল!

দীর্ঘ তিন চার ঘন্টা এক নাগাড়ি পাখা চালাইয়াও সরমার ক্লান্তি নাই। মালিনীর কথার উত্তরে গায়ে হাত বুলাইয়া বলে, এটা তো বিকেল বেলা। টের পাচ্ছিস না?

বিকেল বেলা!

হ্যাঁ, এই তো সন্ধ্যে লাগলো বলে।

আমি যাবো।

কোথায় যাবি!

আমায় নিয়ে চল।

কোথায়?

তোর বাড়ি।

বেশ তো যাবি, তাতে আর হয়েছে কি!

রাত্তিরে আমি তোর কাছে থাকবো।

বেশ তো!

আমায়, সরমা, তুই তোদের বাড়ি নিয়ে চল।

যাবি, তা বলে আগে একটুখানি সুস্থ হ। এক্ষুনি কি আর হেঁটে যেতে পারবি?

পারবো।

এক্ষুনি হাঁটাহাঁটি করলে সুনি আবার বকাবকি করবে।

সুনি! কে সুনি?

আমাদের সুনি।

কে সে! আমি তাকে চিনি না।

চুপ কর।

চিনি না আমি তাকে।

ফের পাগলামি করে!

কেউ নয় সে আমার!

শান্ত হ, ছি!···কি বোটকা গরম!

জ্বলে গেল আমার সারা গা। আমায় বাইরে নিয়ে চল তুই সরমা। যেতে পারবি?

পারবো।

তো ওঠ, আমার কাঁধে ভর দিয়ে ওঠ।

চল।

আস্তে। ছাদের ওপর পাটি বিছিয়ে বালিশ পেতে দেব'খন, কেমন?

বেশ হবে।

সই সরমার কাঁধে ভর দিয়া লঘু শিথিল পদক্ষেপে মালিনী আস্তে আস্তে মিত্তিরবাড়ির ছাতে গিয়া ওঠে। বলে, একলা ঘরে থাকতে রাতে আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করে। আজ কিন্তু তুই আমার কাছে থাকবি সরমা।

থাকবো'খন।...

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে।

চতুর্দশীর চাঁদ। আম কাঁটালের পাতার উপর দিয়া চন্দ্রালোকের রূপালী সুধা যেন টুপ্ টপ্ করিয়া মাটির বুকে ক্ষরিয়া পড়িতেছে। এ সুধা খাওয়া যায় না। আতরের মতো সর্বাঙ্গে মাখিয়া পাগল হইয়া যাইতে হয়।

চরাচর ছবির মতোই নিস্পন্দ—ইঙ্গিতময়। মালিনী আস্তে আস্তে হাতে ভর দিয়া শীতল পাটির উপর উঠিয়া বসে। ভিজে জ্যোৎস্নার ঢল নামিয়াছে যেন গাছগাছালির উপর। আশেপাশে কোথাও একজোড়া লক্ষ্মীপেঁচা থাকিয়া থাকিয়া কর্কশ কলকণ্ঠে গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করিতেছে—হৈ যাক্ হৈ যাক্, তোর ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ, হৈ যাক্।

হুইয়া গেলে তো ভালোই হয়। হয় কই!

একটু স্তিমিত করুণ হাসিয়া মালিনী ছাতের উপর উঠিয়া দাঁড়ায়। তারপর সাপের পিঠের মতো ঠাণ্ডা শীতল পাটির উপর দিয়া দুই এক পা করিয়া ছাতের আলিসার দিকে আগাইয়া যায়। নিচে গাছপালার আড়ালে মিত্তিরবাড়ির ইটখসা ভাঙ্গা পাঁচিলের গায়ে সঞ্চরণশীল ছায়ার মিছিল যেন দূর হইতে তাহাকে নিঃশব্দে ইশারায় ডাকে। ঝিরঝিরে বাতাসের লঘুচপল আনা-গোনায় সে যেন তাহাদের ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তা শুনিতে পায়। মালিনীর মনে হয়, কার্নিশের উপর হইতে বকফুল গাছের

ডালপালা বেড়িয়া নিচের ঐ কাঠটগরের ঝোপের উপর হাত পা ঝাড়িয়া ঝাঁপদিয়া পড়িলে কেমন হয়! স্বপ্নে উপকথার ঘুমন্ত পরীকন্যার স্তিমিত হাসির মতো স্নিগ্ধ চাঁদছোঁয়া পৃথিবীতে সারি সারি ছায়ার মিছিলে নিরবয়ব প্রাণের নিঃশব্দ বিচরণ যেন মানাইবে ভালো। স্থির দৃষ্টিতে সে আলিসার উপর দিয়া মাটির দিকে ঝুঁকিয়া তাকায়। কাঠটগরের ঝোপটা মালিনীর দুই চোখের দৃষ্টি জুড়িয়া মাঝে মাঝে যেন দুই হাতের নাগালের মধ্যে আসিয়া পড়ে; আবার পলক পড়িতে না পড়িতেই দূরে চলিয়া যায়। দুস্তর ব্যবধানের মাঝখানে অসংখ্য আলোর বুদবুদ ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি পোকার মতোই একবার জ্বলে একবার নেভে। অপলক চোখে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিতেই কাঠটগরের ঝোপটা যেন দুই চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে। কার্নিশের বাহিরে হাত বাড়াইয়া দিতেই পায়ের তলাটা মালিনীর শির শির করে, সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া মাথাটা যেন ঝিম ধরিয়া ঘুরিতে থাকে। দুই হাতে ছাতের কার্নিশটা প্রাণপনে একবার সে চাপিয়া ধরে। মনে পড়িয়া যায় তাহার—নাপিতবাড়ির বউ কালীদাসীর কথা। মনের দুঃখে একতলার ছাত হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চিরজনমের মতো হাঁটু ভাঙ্গিয়া গেছে। কাঠটগরের ঝোপের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া শেষকালে কি তাহাকে কালীদাসীর মতো ভাঙ্গা পা লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে নাকি! সে কলঙ্ক মালিনী রাখিবে কোথায়! মালিনী ভাবিয়া

কূল পায় না, বিকলাঙ্গ হইয়া কালিদাসী আজও কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছে।

কার্নিশের উপর হাত রাখিয়া সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কালীদাসীর ভাঙ্গা হাঁটুটা তখনও যেন তাহার দুই চোখের সামনে ত্রিভঙ্গ হইয়া আছে।

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনিতেই মালিনী সচকিত হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়ায়। দেখে সই সরমা শক্ত মুঠায় তাহার আঁচলটা চাপিয়া ধরিয়া প্রহরীর মতো দাঁড়াইয়া আছে। মালিনী কোনো কথা বলে না, শুধু সরমার মুখের দিকে তাকাইয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আঁচল ছাড়িয়া সরমা মালিনীর ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরে। অনুশাসনের সুরে বলে, এখানে কি করছিলি?

মালিনী নিরুত্তর।

সরমা বলিয়া যায়, এ কিন্তু তোর ভারী অন্যায় ভাই, যাই বলো। সঙ্গে করে আমি তোকে নিয়ে এলাম।···ছি, চল।

হাত ধরিয়া টানিয়া সরমা মালিনীকে কার্নিশের নিকট হইতে শীতলপাটির উপর লইয়া যায়।

—বস্ এখানে!

—শীত-শীত করছে।

—শীত করছে? গায়ে দেখি কাপড় পর্যন্ত রাখা যাচ্ছে না। শীত কি বলছিস!

—আমার শীত।

—তোর সবই অদ্ভুত।

—ঠিক বলেছিস তুই সরমা। আমার সবই অদ্ভুত।

—খুব শীত ?

—খুব।

—আমি বরং বাড়িই যাই।

—বাড়ি যাবি !

—হ্যাঁ।

—তবে এলি কেন ?

—শীত করছে কেন এত ?

—করলে আর তার চারা কি ! তা কি বাড়িই যাবি ?

—তাই যাই।

—একলা ঘরে ভয় করে বলছিলি ! থাকতে পারবি তো ?

—পারবো।

—দেখিস ! তো চল। হাত ধরে ধরে আয় !

রাত তখনও বেশি হয় নাই। ছায়াচ্ছন্ন আমবাগানের ভিতর দিয়া লণ্ঠন হাতে সরমার ভাই হরেকৃষ্ণ যায় আগে আগে; আর কাঁধে ভর দিয়া স্খলিত পদক্ষেপে টলিতে টলিতে পিছনে যায় মালিনী।

ভালো বিপদে পড়িয়াছে সরমা। এত কাণ্ড হইবে জানিলে আগে সে কোনো কথাই মালিনীর কাছে ফাঁস করিত না।

করিলেও পেটে রাখিয়া কথা বলিত। ঘটনার সঙ্গে রটনা মিশাইয়া মনের রঙে বিষয়টা এতখানি ফলাও করিয়া তুলিত না। ছাতের ব্যাপারটার কথা ভাবিয়া সরমার সারা গায়ে এখনও কাঁটা দিয়া উঠিতেছে। সাধ করিয়া শেষ পর্যন্ত কি খুনের দায়ে পড়িবে নাকি!

সযত্নে হাত দিয়া বেষ্টন করিয়া সরমা সন্তর্পণে মালিনীকে ঘরে পৌছাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেয়। শিয়রের বালিশটা জুত করিয়া দিয়া মালিনীর গায়ে একখানা কাঁথা টানিয়া দিয়া বলল, কোলের মেয়ে না থাকলে আমি আজ তোর কাছেই থাকতাম। তা আমার তো আর সে উপায় নেই, হাত পা বাঁধা হয়ে গেছি। কি জ্বালাতনটাই না করে সারা রাত। তা বলে যাচ্ছি আমি সুনিকে বিশেষ করে, খোঁজ-ভাঁজ রাখবে'খন রাতে।

কে কি খোঁজ-ভাঁজ রাখবে'খন? কোনো দরকার নেই। আমি একলাই ঠিক থাকবো—অন্তরের বিরক্তি ফেনাইয়া ওঠে মালিনীর প্রত্যেকটা কথায়।

বাধা দিয়া সরমা বলে, বুঝিস না তুই—একবার বলা ভালো, রাতবিরেতের কথা! যদি দরকার হয়!

—কোনো দরকার হবে না।

—বেশ, বলবো না। দরকার নেই বলে।...কিন্তু আর যদি কোনো পাগলামি করিস শুনি তো দেখবি আর কখনও আমি

তোর কাছে আসবো না, দেখিসই।···একটা সীমা তো আছে সব কিছুরই, ছি!

মালিনী কোনো কথা বলে না। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় কাঁথার নিচে মুখ লুকাইয়া শুধু নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিয়া যায়। অন্তর্দাহের এই উষ্ণ প্রস্রবন কাহারো কামনা বাসনার সোনার বাগানে লোনা জলের অভিসম্পাত বহিয়া লইয়া যাইতেছে না। কাহারো বিরুদ্ধে কোনো নালিশ নাই এই চোখের জলে। শুধু নিজের লাঞ্ছিত মানবিক সত্তার উপর একটা নিবিড় মমত্ববোধের দরুন মালিনী আজ নিঃশব্দে অঝোরে কাঁদিতেছে।

বাহিরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। বাড়ি ফিরিবার পথে আর লণ্ঠনের প্রয়োজন হইবে না। কাঠের সিন্দুকের উপর লণ্ঠনের আলোটা কমাইয়া রাখিয়া সরমা দূর হইতে এক মুহূর্ত মালিনীর দিকে ফিরিয়া তাকায়; তারপর চুপিসাড়ে হরেকৃষ্ণর পিছু পিছু ঘরের বাহির হইয়া যায়।

বাড়ি ফিরিবার পথে সাত পাঁচ ভাবিয়া সরমা লম্বা লম্বা শ্বাস টানিয়া সুনন্দার কাছে ঘটনার ইতিবৃত্তান্ত বলিয়া যায়। বলিয়া যায়—একলা ঘরে ভয় করে বলিয়া জোর করিয়া মালিনীর ঘর ছাড়িয়া ছাতে যাওয়ার কথা, তারপর আলিসার উপর হইতে একদৃষ্টে মাটির দিকে ঝুঁকিয়া তাকাইয়া থাকার কথা। সব কথা সকলের শুনিতে নাই। হরেকৃষ্ণকে আগাইতে বলিয়া সরমা

সুনন্দার কানে কানে বলিয়া যায়, নতুন বৌয়ের রকম কিন্তু আমি ভালো বুঝিনি সুনি। খোঁজ খবর নিস দিকিন একটুখানি রাতে!

হাজারো তালের ছত্রিশ রকম কথাবার্তা—মা চপলাসুন্দরী আসিয়া এক কথা বলেন আবার রাত করিয়া সরমা আসিয়া কি সব সৃষ্টিছাড়া মন-চান্‌কানো খবর দিয়া যায়, সুনন্দা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

সুনন্দার অন্তরের সংশয় চোখ ছাপাইয়া দুই ঠোঁটে ভর করিয়া নামে। বলে, তা কি ব্যাপারটা আমায় সত্যি করে একটু খুলে বল দিকিন সরমাদি। আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে।

দুই চোখ বড় বড় করিয়া ঢোক গিলিয়া সরমা বলে, খুলে আর আমি এখন কি বলবো বল্ তোকে। কাছে-পিঠে থাকিস, জানতে বরং তোরাই আগে জানবি। দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে ওর আর কতটুকখানি দেখা হয় বল্।

বাধা দিয়া সুনন্দা বলে, না সে তো সত্যি, তবে সই বলে তো বলতেও পারে দুটো মনের কথা গপ্পে-গপ্পে! হয় না এমন? অবিশ্যি জানতেই যে হবে কিছু এমন কথা আমি বলছিনে।

সুনন্দার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকিয়া সরমা বলে, এমন আর কি কথা বা—তবে দ্যাখো মানুষের মন তো। এক সেই বুড়ো—চক্কোত্তির কথা বলছি, তা সে তো এক রকম জ্বালিয়েই দিয়ে গেল মেয়েটার কপাল।

তারপর ছাখো তার এক ছেলে, সে-ও তো ধরো এক সন্ন্যাসীর মতো চিরকালই ঘরছাড়া—বলতে গেলে এক রকম বিবাগীই। এমন না যে ছেলের দিকে চেয়ে নিজের কথা ভুলে থাকবে।

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সুনন্দা বলে, ছেলের দিকে চেয়ে মানে ?

সরমা হাত মুখ নাড়িয়া বলিয়া যায়, মানে ইচ্ছে করলে ছেলে তো তোমার ঘরসংসারী হয়েও বসতে পারতো। এখন তোমার জেঠিমার মতো অবস্থায় অবলা জাতের আর ভুলে থাকবার কি আছে বলো ! সে দিক দিয়েও তো কোনো আশা পূরণ হলো না ওর। নানা কারণে এখন হয়ে পড়েছে ঐ এক রকম—জীবন থাকলেই বা কী, আর গেলেই বা কী !

সুনন্দা কোনো উচ্চবাচ্য করে না। সরমার মুখের দিকে তাকাইয়া অন্যমনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

সরমা শ্বাস টানিয়া বলে, এখন ছাখ ওরই যেন না হয় জীবনে কোনো আসক্তি নেই, কিন্তু তা বলে এই রকম সব পাগলামি করতে থাকলে আমাদের শুদ্ধু যে ও স্থির থাকতে দেবে না।... শেষকালে কি খুনের দায়ে ফেলবে আবাগী ! ··কি যেন বাপু কি বলতে কি বলে ফেলি ; নতুন বৌয়ের ধরন-ধারণ কিন্তু আমি একেবারেই ভালো মনে করিনে। বলবার কথা বললাম, এখন ছাখো বুঝে তোমরা সবাই। কি সব কাণ্ডোবাণ্ডো ! মনে করলে গা হাত পা পর্যন্ত সব হিম হয়ে আসে গা ! কিছুটা পথ

আগাইয়া গিয়া সরমা আবার ফিরিয়া আসে। বলে, নজর রাখিস কিন্তু একটু সুনি রাত্তে, দেখিস।

হরেকৃষ্ণকে অগ্রবর্তী করিয়া সরমা কোলের মেয়ের কান্নার সুর ধরিয়া ত্বরিতপায়ে ছায়াছন্ন আমবাগানের ভিতর দিয়া বাড়ি চলিয়া যায়।

সুনন্দার চোখে ঘুম নাই। মাটির বুকে কান পাতিয়া সে শুধু আঁজ প্রিয়তমের প্রেতায়িত কামনার সফল সঙ্গীত শুনিতেছে। শূজা নদীর জলে অনাগত ফসলের স্বপ্ন দেখিয়া শতনামপুরের সংকল্প আবার আজ শত শত কোদালির মুখে ধারালো হইয়া উঠিয়াছে।

চর-কাসুন্দি মৌজার অধিবাসীদেরও অধীরতার অন্ত নাই। ঘিওরের চরে রাতরাতি খাল কাটিয়া শূজা নদীর জলতরঙ্গ বহাইয়া দিবে বলিয়া আজ তাহারাও বদ্ধপরিকর।

রাত অনেক। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নাই। চাটাইয়ের বেড়ার রন্ধ্র পথে দূর হইতে মালিনীর ঘরে লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলো দেখা যাইতেছে। জাগ্রত স্বপ্ন চোখে লইয়া সুনন্দা দু-এক পা করিয়া উঠানের উপর দিয়া চক্কোত্তিবাড়ির আটচালায় গিয়া ওঠে। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়া দেখে, মালিনী পুরাতন কাঠের সিন্দুকটার কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাতের কি একটা মিশ কালো দলার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। মালিনী কি বিষ খাইতেছে নাকি!

সুনন্দার পায়ের তলাটা হঠাৎ শির শির করিয়া ওঠে। হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস ঘনীভূত হইয়া তার যেন কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলিতে চায়।
ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখে, সিন্দুকের ডালার উপর অম্বিকাচরণের আফিং-এর প্রাচীন টিনের কৌটাটা খুলিয়া পড়িয়া আছে আর মালিনী ডান হাতের তিন আঙুলে করিয়া সেই কৌটার ভিতরকার নিরেট কালো মৃত্যুর দলা মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া আছে।
সুনন্দার কানের কাছে হঠাৎ যেন তাহার রাঙ্গা-মামার সেই বিস্মৃত সতর্কবাণী উচ্চকিত হইয়া ওঠে—কোনো অধিকার নেই মরে যাবার তোমার নমিতা, দরজা খোল, দরজা খোল, নমিতা।
এক মুহূর্তও হারাইবার নাই। ক্ষিপ্র মার্জারীর মতো লঘু ত্রস্ত পদক্ষেপে সুনন্দা নিমেষে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পিছন দিক হইতে মালিনীর হাতখানা চাপিয়া ধরে: জেঠিমা!
জেঠিমার সাড়া নাই। বজ্রাহতের মতো মালিনী নীরব নিস্পন্দ —দেহমনের সমস্ত তন্ত্রীগুলি যেন অসহ্য একটা বেদনায় টন্ টন্ করিয়া হঠাৎ ছিঁড়িয়া গিয়াছে।
কাহারো জন্য এতখানি সহানুভূতি বোধ করি সুনন্দার আগে কোনোদিনও হয় নাই। মালিনীর শোলার মতো হালকা দেহটি

দুই হাতে জড়াইয়া সুনন্দা কোমল কণ্ঠে বলে, কেন জেঠিমা, এ সব কেন। নিবিড় একটা সমবেদনায় সুনন্দার চোখ দুটিও ছল ছল করিয়া ওঠে।

জেঠিমার মুখে কোনো কথা নাই। দারুণ একটা লজ্জার গ্লানি যেন সারা মুখখানির উপর একটা অপমানের কালো পর্দা টানিয়া দিয়াছে। এত লোকের মরণ হয়, মালিনীর মরণ নাই!

মালিনীর মুখের উপর হইতে বিস্রস্ত চুলগুলি কানের দুই পাশে আলগোছে সরাইয়া দিয়া সুনন্দা বলে, লাভ কি এ সব করে জেঠিমা, ছি!

লাভ নাই ঠিকই। কিন্তু করণীয়টাই বা কি আছে সংসারে। সে কথা তো কেউ কোনো দিন বলিতে আসিল না একটু সময় করিয়া! ভাঙ্গা কুলার মতো শুধু ছাই ফেলিবার প্রতীক্ষায় আর কত কাল বসিয়া থাকা যায়! করুণায় করুণায় মালিনী নিজেকে অনেক ছোট করিয়াছে। এখন নিজের কাছেই লজ্জা রাখিতে তাহার ঠাঁই নাই। মালিনীর এখন মরণই ভালো।

অনুকম্পা মালিনীর অসহ্য ঠেকে। মানুষ খালি ছি ছি করিবে, অথচ ভিখারীর মতো তাহাকে আবার সেই মানুষের মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকিতে হইবে—এ অসম্ভব।

অনিরুদ্ধ আবেগ হঠাৎ দারুণ আক্ষেপে ঝন ঝন করিয়া ওঠে মালিনীর কণ্ঠে, আমি তা হলে কি করবো তুই বলতে পারিস শুনি?

জাগ্রত জনপদের হৃৎপিণ্ডটা যেন দ্রুততালে নাচিয়া ওঠে সুনন্দার বুকের মাঝখানে। বলে, পারি। কিন্তু তুমি কি পারবে জেঠিমা?

ভাবিয়া দেখিবার অবসর লইলেই যেন কালো মৃত্যুর ধুলাটা মুখের কাছে উঠিয়া আসিতে চাহে—ঠাকুরঝি পুকুরের বিচিত্রবর্ণ চাঁদা মাছটা ছুটিয়া আসিয়া চোখের সামনে মায়া ছড়ায়, ইটখসা ভাঙ্গা পাঁচিলের গায়ে ছায়ার ঝিলিমিলিগুলি দূর হইতে মালিনীকে হাতছানি দিয়া ডাকে।

মালিনী যেন ভয় পাইয়াই সুনন্দাকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরে। বলে, পারবো!

সুনন্দা মালিনীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। জাগ্রত জনপদের প্রাণশক্তির উচ্ছ্বাস ওর চোখে মুখে। বলে, ঘিওরের চরে কোদাল পড়েছে আজ রাত থেকে জেঠিমা। দশ হাতে রাতারাতি খাল কেটে সূজা নদীর জল বইয়ে দিতে হবে সারা চর-কাসুন্দি মৌজায়। যাবে তুমি সেখানে?

অসি-ধার প্রাণরেখার উপর দিয়া, ভারসাম্য ঠিক রাখিয়া এখন যেন শুধু সামনের পথ অতিক্রম করিয়া চলা। ডাইনে বামে গহীন মরণের খাল। অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া দেখিবারও সময় নাই মালিনীর। বলে, যাবো।

চক্ চক্ করিয়া ওঠে সুনন্দার দুইটি আয়ত চক্ষু। বলে, সেই ঘিওরের খাল, শতনামপুরের কলঙ্ক!